প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

দশম বর্ষ ● চতুর্থ সংখ্যা ● ঢাকা ● অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, *প্রথম আলো*

নির্বাহী সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; প্রধান নির্বাহী, নলেজ অ্যালায়েন্স

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, *প্রথম আলো*

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

দাম : ১০০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.prothom-alo.com/protichinta, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

---

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
October-December Issue, 2020; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 100 Taka
Prothom Alo Bhaban, 19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81, 09613113366

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে অতিমারির নৈতিক ও রাজনৈতিক অর্থনীতি ৯
তারিক ওমর আলি, মির্জা হাসান এবং নাওমি হোসেন

সমাজতত্ত্ব

মহামারির অন্তরালে ৪১
বদরুল আলম খান

রাজনীতি

বর্ণবাদ, স্বাস্থ্যবৈষম্য এবং অতিমারি : যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গ ৫৯
হাফিজা বেগম

সমীক্ষা

করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তনশীল পদ্ধতি : ১৬ দেশের মধ্যে তুলনা ৮৯
রাজীব চৌধুরী, কেভিন হেং, মো. সাজেদুর রহমান শাওন, গ্যাব্রিয়েল গো, ডেইজি ওকোনোফুয়া, ক্যারোলিনা ওচোয়া-রোসালেস, ভ্যালেন্টিনা গঞ্জালেস-জারামিল্লো, আব্বাস ভূঁইয়া, ড্যানিয়েল রিডপাথ, শামিনি প্রথাপন, সারা শাহজেদ, ক্রিশ্চিয়ান এল. আলথুস, নাথালিয়া গঞ্জালেস-জারামিল্লো, ওসকার এইচ. ফ্রাঙ্কো

নারী

নারীর প্রতি সহিংসতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ১০৩
আইরিন খান

লেখক পরিচিতি ১২১

সম্পাদকীয়

এবারের সংখ্যার বিষয়বস্তু করোনাভাইরাসের নানা আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা। করোনাভাইরাসের প্রভাব নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ বহু আলোচনা, লেখাজোখা পত্রপত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে শুরু থেকেই। করোনাভাইরাস নিয়ে আরেকটি সংখ্যা করার যৌক্তিকতা হলো প্রতিচিন্তার এই সংখ্যায় বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণের দিকে নজর দেওয়া। কিন্তু এর বাইরে আরও অনেক বিশ্লেষণ প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

প্রথমেই আসা যাক বাংলাদেশ প্রসঙ্গে। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের কারণে প্রয়োজনীয় লকডাউন বেশি দিন বজায় রাখা যায়নি, যদিও এ দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনায় করোনাভাইরাসে আক্রান্তের হার কমাতে হলে লকডাউন ছিল অপরিহার্য। কোন পরিস্থিতি এবং ঠিক কী কারণে বাংলাদেশ রাষ্ট্র লকডাউন তুলে নিতে বাধ্য হলো, সেই আলোচনা পাওয়া যাবে তারিক ওমর আলি, মির্জা হাসান এবং নাওমি হোসেনের লেখায়। তাঁরা দেখিয়েছেন বাংলাদেশে সমাজের তুলনায় রাষ্ট্র দুর্বল। সেটি একটি বড় কারণ। এ ছাড়া শক্তিশালী নৈতিক অর্থনীতির ধারণা এখানে কাজ করেছে। এ বিষয়গুলোসহ আরও কিছু কারণ তাত্ত্বিকভাবে দেখার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে বাংলাদেশ বিষয়ে এই বিশ্লেষণ তাঁরা দিয়েছেন। লেখাটি বিশ্বখ্যাত *ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট* জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজি ভাষায়। বাংলা করেছেন খলিলউল্লাহ্।

এবারে আসা যাক করোনাভাইরাস নামক এই অতিমারির অন্তর্নিহিত কারণ প্রসঙ্গে। বদরুল আলম খান তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন করোনা অতিমারির অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ। এগুলো বিশ্লেষণ করে তিনি আধুনিক-উত্তর সমাজের মূল সমস্যার দিকে নজর দিতে চেষ্টা করেছেন। এটি যে আকস্মিক কোনো ঘটনা ছিল না, বরং বিদ্যমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে এই ভাইরাসের

আগমন, তার চিত্রায়ণ ঘটেছে এ লেখায়। বিশেষ করে নিও লিবারেল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গর্ভেই যে এই ভাইরাস জন্ম নেওয়ার পেছনের কারণগুলো সুপ্ত ছিল, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এখানে।

২০২০ সালের বছরটি করোনাভাইরাসের আলোচনায় বিমূঢ় থেকেছে। এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনও ছিল সারা বিশ্বের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে। আর এই নির্বাচনের আগে করোনাভাইরাসের অভিঘাতে সবচেয়ে বিপর্যস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রকাঠামোর অন্তর্নিহিত বৈষম্যও চলে আসে আলোচনায়। ফলে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের সমতার লড়াই হিসেবে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনও চরম আকার ধারণ করে। যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা পৃথিবীতেই এই আন্দোলনের আলোচনা চলে অনবরত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এ প্রেক্ষাপটে হাফিজা বেগম লিখেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদ, স্বাস্থ্যবৈষম্য ও অতিমারি নিয়ে। বর্ণবাদের কারণে সৃষ্ট কাঠামোগত স্বাস্থ্যবৈষম্যের প্রভাবে কীভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর করোনাভাইরাসের অভিঘাত বেশি হয়েছে, তা পাওয়া যাবে এ লেখায়। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র এই ভাইরাসে অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি আক্রান্ত হলেও আফ্রিকান-আমেরিকান জনগোষ্ঠীর মধ্যে এর প্রভাব দেশটির অন্যান্য জনগোষ্ঠীর চেয়ে বেশি। এ প্রেক্ষাপটে এই লেখা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।

করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে আলোচিত পদ্ধতি ছিল লকডাউন। এই ভাইরাসের যেহেতু নির্দিষ্ট কার্যকর কোনো ওষুধ নেই, তাই ওষুধের বাইরে স্বাস্থ্যবিধি মানা এবং লকডাউনের মতো পদ্ধতির মাধ্যমেই রাষ্ট্রগুলো ভাইরাস মোকাবিলার নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় এই পদ্ধতি সব দেশের জন্য কার্যকর পদ্ধতি হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে লকডাউন মাঝে মাঝে শিথিল করে অর্থনীতি স্বাভাবিক রাখার কথা ভাবা হয়। এই বিবেচনায় দেখা দরকার যে টানা লকডাউন চলতে থাকলে ফল কী দাঁড়ায় এবং মাঝে মাঝে তা শিথিল করলেই-বা ফল কী হয়। বেশ কিছু পরিবর্তনশীল পদ্ধতি খুঁজে পেতে বিশ্বের বিভিন্ন ধরনের শাসনপদ্ধতি এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতার ১৬টি দেশের মধ্যে একটি গবেষণা করা হয়েছে। ১৬ জন গবেষক মিলে এই লেখা প্রস্তুত করেছেন। ২০২০ সালের মে মাসে *ইউরোপিয়ান জার্নাল অব এপিডেমিওলজি* সাময়িকীতে লেখাটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা করেছেন প্রতীক বর্ধন।

বদরুল আলম খানের লেখায় আলোচনা করা হয়েছে নিও লিবারেল ব্যবস্থা কীভাবে এই করোনাভাইরাস আগমনের পেছনের কারণগুলোয় অবদান রেখেছে। করোনা অতিমারির প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দায় এখন ক্রিটিক্যাল ঘরানার বিশ্লেষক ও গবেষকেরা জোরেশোরে আলোচনায় নিয়ে আসছেন। সেই প্রেক্ষাপটে

দেখা দরকার এই নিও লিবারেল ব্যবস্থা কীভাবে পুরো বিশ্বব্যাপী জেঁকে বসেছে। ২০০৫ সালে ডেভিড হার্ভে *আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব নিও লিবারেলিজম* নামে একটি বই লিখেছিলেন। সেই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়টি ছিল এর তাত্ত্বিক ভিত্তি। সেখানে দেখানো হয়েছে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জায়েজ করার জন্য কীভাবে প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করা হয়েছিল। করোনাভাইরাসের উৎসের কারণ খুঁজে বের করার প্রয়াসে নিও লিবারেলিজম জায়েজ করার প্রেক্ষাপটটি বোঝা তাই জরুরি। সে বিবেচনা থেকেই ছাপা হলো লেখাটি। বাংলা করেছেন খলিলউল্লাহ্।

করোনাভাইরাসের কারণে লকডাউন শুরু হওয়ার পর ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সামাজিক অনেক সমস্যার সঙ্গে হাজির হয় নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির নতুন ধারা। স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়ে যাওয়ার এসব ঘটনা নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা ও জরিপের ফলাফল থেকে ধারণা পাওয়া যায়। সে বিবেচনায় নারীর প্রতি সহিংসতার মনস্তাত্ত্বিক কারণ নিয়ে বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আইরিন খান তাঁর লেখায় সিগমুন্ড ফ্রয়েডের ধারণা ও তত্ত্ব ব্যবহার করে নারীর প্রতি সহিংসতার মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন।

রাজনৈতিক অর্থনীতি

বাংলাদেশে অতিমারির নৈতিক ও রাজনৈতিক অর্থনীতি

তারিক ওমর আলি, মির্জা হাসান ও নাওমি হোসেন

সারসংক্ষেপ

২০২০ সালে বাংলাদেশে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর বাংলাদেশ সরকার লকডাউনের (অবরুদ্ধ) ঘোষণা দেয়, পাশাপাশি দেয় ত্রাণ কর্মসূচির ঘোষণাও। শুরুতে দেশের মানুষ লকডাউনের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। কিন্তু তা বেশি দিন টেকেনি। মানুষ দ্রুতই আগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ফিরে আসে। ত্রাণ কর্মসূচি ছিল ধীরগতির এবং অনিশ্চিত। তাই নাগরিকেরা সরকারের সহায়তার ওপর নির্ভর করতে পারছিল না। সে জন্যই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ন্ত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার লকডাউন তুলে নেয়। এমন জনঘনত্বপূর্ণ, নিম্ন আয়ের দেশে অতিমারি নিয়ন্ত্রণে লকডাউন ছিল অপরিহার্য। এই নিবন্ধে দেখানো হবে কেন বাংলাদেশ সরকার লকডাউন বজায় রাখতে সক্ষম হলো না। বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে নীতি প্রণয়ন এবং তা বলবৎ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার তত্ত্ব ব্যবহার করা হবে। ছয়টি কমিউনিটি নির্বাচন করে প্রাথমিক গুণগত মুঠোফোনভিত্তিক গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে এই নিবন্ধ লেখা হয়েছে। নিচের সারির রাজনৈতিক নেতাদের ওপর বলপ্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য কোন পদ্ধতিতে রাষ্ট্র নিজের সক্ষমতা ব্যবহার করেছে, তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র নিজ বৈধতা টিকিয়ে রাখা এবং তা সম্প্রসারণের চেষ্টা করেছে। উপসংহারে বলা হয়েছে যে ক) বিগত দশকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খ) অর্থনৈতিক সচ্ছলতা নষ্ট না করেও অতিমারি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবস্থা গ্রহণের পেছনে জোরালো রাজনৈতিক প্রণোদনা রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনগণের কাছে বৈধতা বজায় রাখার চাপের কারণে রাষ্ট্র এবং এর সামনের সারির ব্যক্তিরা বাধ্য হয়েছেন লকডাউনের নিয়ম ভঙ্গ সহ্য করতে। এর মাধ্যমে জাতীয় জনস্বাস্থ্যবিষয়ক উদ্বেগের চেয়ে গরিবদের তাৎক্ষণিক জীবিকার তাগিদ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক এলিটদের ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগে ক্রমাগত ব্যর্থ হয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ত্রাণ কর্মসূচিরও

● অনুবাদ : **খলিলউল্লাহ্**

সুষ্ঠু ও সময়ানুগ বণ্টন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এই দুর্বলতার পেছনে ব্যাপকভাবে আলোচিত 'নৈতিক অর্থনীতির' ধারণার যোগসূত্র রয়েছে। নাগরিকদের লকডাউন মেনে না চলা এবং এর বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগে সরকারি কর্মকর্তাদের বিরত থাকা—দুটোরই জোরালো নৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি পাওয়া যায় নৈতিক অর্থনীতির ধারণায়। করোনা অতিমারি দুটো বিষয় স্পষ্ট করেছে। একটি হলো বৈশ্বিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে আসা নতুন ধাক্কা সামলানোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্ষমতার গুরুত্ব, অন্যটি হলো যে কাঠামোয় শক্তিশালী সমাজে দুর্বল রাষ্ট্র বিরাজ করে, সেই কাঠামোর চ্যালেঞ্জ।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

বাংলাদেশ, করোনা, নৈতিক অর্থনীতি, সামাজিক সুরক্ষা, রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা।

১. ভূমিকা

ঐতিহাসিকভাবেই অতিমারিকালীন যেকোনো দেশের সরকার কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়ে। এ সময় সরকারের সক্ষমতার পরীক্ষা হয়। অর্থাৎ সরকার জনগণের ভয়ে, টেকনোক্র্যাট ও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ উভয়ের পরামর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে অর্থনৈতিকভাবে যারা এলিট, তাদের বস্তুগত স্বার্থের বিরুদ্ধে সরকারি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে কি না (Slack 1995)। কিন্তু কোন ধরনের সরকার অতিমারি কার্যকরভাবে সামলাতে সফল হয়? এবং কেন হয়? একটি প্রভাবশালী তবে অপ্রমাণিত অনুমান হলো, কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো করোনাভাইরাস মোকাবিলা ও সামলানোর ক্ষেত্রে বেশি সফল হয়েছে। কারণ, গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর তুলনায় কর্তৃত্ববাদী সরকারের বলপ্রয়োগের ক্ষমতা বেশি থাকে। আবার সেই ক্ষমতা ব্যবহারেও তারা ইচ্ছুক (Frey, Chen, and Presidente 2020)। কিন্তু করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে। এই ভাইরাস সামলানোর ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থার ধরনের কারণে সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ধারণে কোনো তারতম্য হয়নি; বরং নীতি গ্রহণের বিষয়টি অতীত অতিমারির অভিজ্ঞতা, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের সক্ষমতা, জাতীয় নেতৃত্বের ধরন, রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক এবং বিপন্ন জনগোষ্ঠীর ওপর করোনাভাইরাসের প্রভাব বিষয়ে সজাগ দৃষ্টির ওপর ভিত্তি করে সাফল্য বা ব্যর্থতা ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে (Capano et al. 2020)। একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সফল হওয়াটা সরকারের চাপ প্রয়োগের চেয়ে বেশি নির্ভর করে জনগণের স্বেচ্ছায় মেনে চলার ওপর' (Kleinfeld 2020)। কিন্তু রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ ছাড়াও তাহলে নাগরিকেরা কখন আইন মেনে চলে? এই নিবন্ধে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি করা হয়েছে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অতিমারিবিষয়ক নীতি প্রণয়ন ও বলবৎ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্ষমতার তত্ত্বের আলোকে।

২০২০ সালের এপ্রিল মাসের শুরুতে করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে দেশব্যাপী লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে সংক্রমণ বৃদ্ধি

পাওয়া সত্ত্বেও লকডাউন বহুলাংশেই বাতিল করা হয়। এই ছয় সপ্তাহ সময়ব্যাপী নাগরিকেরা প্রথমে লকডাউন মেনে চলার চেষ্টা করেছে; কিন্তু মে মাসের মধ্যে বহু লোক স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। জীবিকার ভয়াবহ ক্ষতি এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার মতো ত্রাণ কর্মসূচির অভাবের কারণে অনেক মানুষ লকডাউন মানতে রাজি হয়নি। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বাংলাদেশে লকডাউনের গতিশীলতা বিশ্লেষণের জন্য একটি প্রাথমিক সূত্র পাওয়া যাবে জোয়েল মিগডালের রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার ধারণায় (Migdal 1988) এবং মাইকেল ম্যানের 'অবকাঠামোগত ক্ষমতার' ধারণা, অর্থাৎ 'নাগরিক সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং পুরো দেশব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্ষমতার' ধারণায় (Mann 2008, 355)। বৃহৎ পরিসরের এসব সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও আমরা ব্যক্তির লাভ-ক্ষতি নির্ধারণী পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। এই পদ্ধতি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কৌশলগত প্রণোদনা এবং যেসব পদ্ধতির মাধ্যমে এসব প্রণোদনা বাংলাদেশে কাজ করছে, সেগুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে পারা। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম এবং নাগরিকদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আন্তসম্পর্কের মাধ্যমে কীভাবে লকডাউনের বিধি ভঙ্গ হয়েছে, তা বুঝতে আমরা মার্গারেট লেভির বিশ্লেষণ ব্যবহার করেছি। লেভি বিশ্লেষণ করেছেন, কী কারণে নাগরিকেরা সরকারের নীতি মেনে চলে। যেসব ধারণা এসব নীতি মেনে চলাকে বৈধতা দেয়, সেগুলোও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন (Levi 1997)। অ্যালিশা হল্যান্ডের 'বিরত থাকার' ধারণার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব, কোন বিষয়গুলোর কারণে রাষ্ট্র নিয়মভঙ্গকারীদের প্রতি শিথিলতা দেখায় (Holland 2016)। বাংলাদেশের রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্ক দেশটির করোনাভাইরাস বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ কীভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা এসব তাত্ত্বিকের ধারণাগুলোর আলোকে আমার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করব।

এই নিবন্ধে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে লকডাউনের কারণে জীবিকার সংকট হবে জেনেও কেন লকডাউন দেওয়া হয়েছিল, এবং কী কারণে নাগরিকেরা লকডাউন মেনে চলা বন্ধ করে দিল, এবং শেষমেশ তা সম্পূর্ণ বাতিল করে দিতে রাষ্ট্রের ওপর তারা চাপ তৈরি করেছিল। বেশ কিছু কারণে অতিমারিতে রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার গতিশীলতা এবং রাষ্ট্র-নাগরিক সম্পর্কের বিষয়টি গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি মূল্যবান উদাহরণ। প্রথমত, অতি জরুরি মানবিক, উন্নয়নমূলক এবং জনস্বাস্থ্যবিষয়ক প্রেরণা ছিল, বাংলাদেশের রয়েছে ১৭ কোটির এক বিপুল ঘনত্বপূর্ণ জনসংখ্যা, যাদের রয়েছে উচ্চ মাত্রার দারিদ্র্য, বিপন্নতা এবং দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থা : অনিয়ন্ত্রিত করোনাভাইরাস মহা মারির প্রভাব হতে পারত বিপর্যয়পূর্ণ (World Bank 2020)। লকডাউনের দুই সপ্তাহের মধ্যে দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ এবং দারিদ্র্যসীমার ওপরে থাকা অনেকেরও সব ধরনের আয়রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। বেশির ভাগ কর্মসংস্থান যে নিরাপত্তাহীন এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ধরনের, তা এই অবস্থা থেকে বোঝা

যায় (Rahman and Matin 2020)। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার বিষয়টি বিশেষ আগ্রহের। কারণ, বিগত দশকে দৃশ্যমানভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনীতি ও সামাজিক নিরাপত্তা সেবার প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার প্রথম তিন দশকের তুলনায় রাষ্ট্রের রাজস্ব ও প্রশাসনিক সক্ষমতার পাশাপাশি বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (Hassan and Nazneen 2017)। এই নিবন্ধে দেখানো হয়েছে যে রাষ্ট্রের ব্যাপারে নাগরিকদের প্রত্যাশাও সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে (যদিও এসব প্রত্যাশা মিটেছে বলে মনে হয়নি, অন্তত করোনাভাইরাস-সংশ্লিষ্ট ত্রাণ কর্মসূচির প্রেক্ষাপটে)। সবশেষে, যদিও পূর্ব এশীয় মডেলের 'উন্নয়নমূলক রাষ্ট্র' বাংলাদেশ নয় (Hassan 2013), কিন্তু মানব উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকারি নীতি তুলনামূলক সফলভাবে বাংলাদেশ প্রয়োগ করতে পেরেছে (Mahmud, Asadullah, and Savoia 2013), এবং দুর্যোগ ও জীবিকার সংকট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সক্ষমতার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (Hossain 2018)।

এ থেকে বোঝা যায় যে অতিমারি নিয়ন্ত্রণে জোরালো রাজনৈতিক প্রণোদনা এবং ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা বাংলাদেশের রয়েছে। তবু এই নিবন্ধে দেখা যাবে যে অতিমারির মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের ওপর বাংলাদেশের সামাজিক মূল্যবোধ একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক হিসেবে রয়ে গিয়েছিল। সারাহ হোয়াইটের পর্যবেক্ষণও জোয়েল মিগডালের মতোই। আর সেটি হলো বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী সমাজে দুর্বল রাষ্ট্র (Migdal 1988; White 1999)। আমাদের মতে, ২০ বছর পরও সেই পর্যবেক্ষণ একই রকম রয়ে গেছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনবৈধতা নিবিড়ভাবে এর নীতি-কার্যদক্ষতার ওপর নির্ভরশীল রয়ে গেছে। বিশেষ করে জীবিকা ও বেঁচে থাকার সংকটে পুনঃপুন পতিত হওয়া লাখ লাখ নিরাপত্তাহীন ও বিপন্ন নাগরিককে সুরক্ষা প্রদানের সক্ষমতার দিক থেকে দেখলে এটি বোঝা যাবে। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা বিষয়ে আমাদের বিশ্লেষণে অতিমারিকালে রাষ্ট্রকৌশলে জনসম্মতির তাৎপর্যের ওপর নজর দেওয়া হবে। রাষ্ট্র চাইলে নাগরিকদের ওপর অজনপ্রিয় নীতি আরোপ করে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে কি না এবং এর মধ্যে যে ক্ষমতার ধারণা রয়েছে, তার ব্যাখ্যায় আমরা নজর দিচ্ছি না। এর বদলে শাসনব্যবস্থার ব্যাখ্যার দিকে নজর দেওয়া হবে, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র এবং এর নাগরিকের মধ্যে আন্তসম্পর্কের ওপর জোর দেওয়া হবে।

করোনাভাইরাসের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের পদক্ষেপ গ্রহণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'নৈতিক অর্থনীতি' চিন্তা। এই চিন্তায় মনে করা হয় যে বেঁচে থাকার জন্য লকডাউন ভাঙা বা পরিত্যাগ করার জোরালো যৌক্তিকতা রয়েছে। একইভাবে নৈতিক অর্থনীতি চিন্তায় জোরালো বোধ তৈরি হয় যে সংকটের সময় জনগণের সুরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের (আরও দেখুন Jahan and Hossain 2017)। 'নৈতিক অর্থনীতি'

ধারণার মাধ্যমে আমরা ই পি টমসনকে অনুসরণ করেছি। তিনি জীবনধারণের ন্যূনতম অর্থনৈতিক অধিকার বিষয়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত একগুচ্ছ রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বিশ্বাস চিহ্নিত করার পাশাপাশি সেসব অধিকার সুরক্ষায় সরকারি কর্তৃপক্ষের দায়িত্বও চিহ্নিত করেছেন। যেসব রাষ্ট্রীয় নীতি ও উদ্যোগ (রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক) জীবিকাকে হুমকির মুখে ফেলে, তার বিরুদ্ধে জনগণের বিরোধিতা করার যৌক্তিক কারণ পাওয়া যায় এই যুক্তি থেকে (Thompson 1991)। এ থেকে জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য লকডাউন বিধি অমান্য করার বৈধতা পাওয়া যায়। এই নিবন্ধে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে করোনা দুর্যোগকালে নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার সক্ষমতার ওপর রাষ্ট্রীয় বৈধতা এতটাই নির্ভরশীল যে যখন প্রয়োজনীয় মাত্রায় ও যথাযথ সময়ে ত্রাণ দিতে রাষ্ট্র ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, তখন রাষ্ট্র লকডাউন এবং অতিমারি নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। জীবিকা সংকটের সময় সুরক্ষা প্রদানে সরকারি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সম্পর্কে অপ্রাতিষ্ঠানিক কিন্তু গভীরভাবে ধারণ করা একগুচ্ছ নৈতিক অর্থনীতি বিশ্বাস রয়েছে। এসব বিশ্বাসের মানে হলো মানুষকে জোর করে লকডাউনের আওতায় ফেলা যাবে না। এর ফলে নাগরিকদের কিছু মাত্রায় নিয়ম ভাঙার যৌক্তিকতা তৈরি হয়, পাশাপাশি সরকারি কর্তৃপক্ষের দিক থেকে এই নিয়ম ভাঙার বিষয়টি ক্ষমা করা কিংবা এর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে বিরত থাকার যৌক্তিকতাও তৈরি হয়।

নিবন্ধটি সাজানো হয়েছে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে। পরবর্তী অংশে বাংলাদেশে অতিমারির প্রেক্ষাপটগত পটভূমি তুলে ধরে এই নিবন্ধের বিশ্লেষণের মূল ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করা হবে। এরপরের অংশে গবেষণার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে লকডাউনের দুই পর্বে পরিচালিত গবেষণায় ছয়টি গবেষণা স্থান থেকে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল তুলে ধরা হবে। চতুর্থ অংশে রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা, অবকাঠামোগত ক্ষমতা এবং নৈতিক অর্থনীতির ধারণার আলোকে গবেষণার ফলাফল আলোচনা করা হবে। নিবন্ধের উপসংহারে সরকারি নীতির চ্যালেঞ্জ প্রতিফলিত হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ হলো অতিমারিকালীন 'শক্তিশালী সমাজে দুর্বল রাষ্ট্র'। এ ছাড়া এই নিবন্ধে সরকারি নীতি বলবৎ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্ষমতা বিষয়ে নৈতিক অর্থনৈতিক মূল্যবোধের দিকে নজর দেওয়ার মাধ্যমে যেসব তাত্ত্বিক আলোচনা সামনে আনা হয়েছে, সে বিষয়টিও উপসংহারে প্রতিফলিত হয়েছে।

২. তাত্ত্বিক কাঠামো ও গবেষণা পদ্ধতি

রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার ধারণা : অবকাঠামোগত ক্ষমতা, জরুরি অবস্থায় মেনে চলা এবং বিরত থাকা

বাংলাদেশে যা ঘটেছে, তা ব্যাখ্যা করতে আমরা জোয়েল মিগডালের (১৯৮৮)

রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা, অর্থাৎ বলা যায় ‘সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ, সামাজিক সম্পর্কগুলো নিয়ন্ত্রণ, সম্পদ আহরণ এবং নির্ধারিত পন্থায় সম্পদ ব্যবহার’ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্ষমতার আলোচনা ধার করেছি (১৯৮৮, ৪;)। মিগডালের পর্যবেক্ষণ যে ‘[সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন]...এবং অন্য যেসব প্রতিষ্ঠান নিয়মকানুন বলবৎ করে থাকে—সেগুলো এককভাবে বা একটি আরেকটির সঙ্গে মিলে মানুষকে বেঁচে থাকার উপায় প্রদান করে থাকে’ (ibid : p. 29)। এই পর্যবেক্ষণ থেকে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্কের গতিশীলতা বোঝার একটি কার্যকর কাঠামো পাওয়া যায়। কারণ, রাষ্ট্র এবং সামাজিক ব্যক্তিরা করোনাভাইরাসে সৃষ্ট সংকটের মতো অভূতপূর্ব সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট কীভাবে মোকাবিলা করবেন, তা নির্ধারিত হয় এসব গতিশীলতার মাধ্যমে। রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার ব্যাপারে আমাদের ধারণা যে বিষয়টির মাধ্যমে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে, তা হলো মাইকেল ম্যানের দুই ধরনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধরনের মধ্যে পার্থক্য। একটি হলো স্বৈরাচারী আর অন্যটি হলো অবকাঠামোগত। স্বৈরাচারী ক্ষমতা বলতে বোঝানো হয় ‘সেসব পদক্ষেপ, যেগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এলিট বা বনেদি ব্যক্তিরা নাগরিক সমাজের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই গ্রহণ করতে পারেন’ (Mann 2008, 355)। আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্যের জন্য আমরা রাজনৈতিক সমাজের কাছ থেকে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বজায় রাখার বিশ্লেষণ করেছি। অবকাঠামোগত ক্ষমতা বলতে বোঝানো হয় ‘...নাগরিক সমাজের ওপর প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ এবং সমগ্র ভূখণ্ডব্যাপী নিজ পদক্ষেপ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের সক্ষমতা’ (ibid : 355)। এসব সক্ষমতার মধ্যে রয়েছে রাজস্ব নিরূপণ ও সংগ্রহ এবং করোনাভাইরাসের সঙ্গে বেশি প্রাসঙ্গিক হলো জরুরি সেবা ও জীবিকার চাহিদার সংস্থান করা। এর মাধ্যমে যেখানে প্রয়োজন সেখানে কর্মসংস্থান ও সামাজিক সহায়তা অন্তর্ভুক্ত করা (Mann 1988)। অবকাঠামোগত সক্ষমতা বলতে এটিও বোঝায় যে রাষ্ট্র চাইলে আমলাতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে নিজ অবকাঠামোর মাধ্যমে নাগরিক সমাজের কর্মকাণ্ড সমন্বয় করতে পারে।

এই প্রবন্ধে আমরা লকডাউন-সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার বহুমুখী মাত্রাগুলোর প্রভাব খতিয়ে দেখার চেষ্টা করব। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের সক্ষমতা; রাজনৈতিক সমাজের কাছ থেকে এর কার্যকর স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় বৈধতার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ। তবে রাষ্ট্রের অবকাঠামোগত ক্ষমতাকে আমরা শুধু আধিপত্যের বিষয় হিসেবে দেখি না। এর অংশত কারণ হলো, বাংলাদেশি রাষ্ট্র কীভাবে ক্ষমতার চর্চা করে, তা আমরা ইতিমধ্যেই জানি। এর মানে হলো সক্ষম রাষ্ট্রের যেসব রসদ থাকে, তেমন খুব কম রসদের ওপরই বাংলাদেশি রাষ্ট্র সাধারণত হুকুম কায়েম করতে পারে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র নিজ নীতির মাধ্যমে যেটুকুই বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে, তা সে

করেছে বড় আকারে বাংলাদেশি সমাজের চাহিদা ও পছন্দের সঙ্গে তাল রেখে নীতি গ্রহণের মাধ্যমে। এই বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়; কারণ, বাংলাদেশে তুলনামূলক সমতল ও সমজাতীয় সামাজিক কাঠামো বিদ্যমান এবং রাষ্ট্রের অধীনে থাকা বনেদি গোষ্ঠী ও আমজনতার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তেমন কোনো পার্থক্য নেই (Hossain 2017)। বাংলাদেশে ক্ষমতার ভারসাম্য বা রাজনৈতিক সমঝোতা নির্ভর করে সামাজিক চুক্তির ওপর। এই চুক্তি নির্ভর করে আমজনতার জন্য অন্তত সর্বনিম্ন সুরক্ষা নিশ্চিত করার ওপর, আবার একই সঙ্গে এলিট বা বনেদি গোষ্ঠীকে তাদের আনুগত্য কিংবা সম্মতির জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের ওপর। এর ফলে এলিটদের নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব কমানোর পাশাপাশি আমজনতার দিক থেকেও হুমকি কমানো যায় (Hassan 2013; Khan 2013)।

এসব কারণে, অতিমারি বিষয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সক্ষমতার যে বিশ্লেষণ আমরা করেছি, সেখানে যেসব শর্তের অধীনে নাগরিকেরা লকডাউনের নীতিমালা মেনে চলেছিল, সেগুলো খতিয়ে দেখা হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট যেসব শর্তের অধীনে নীতিনির্ধারকেরা নিয়ম ভঙ্গ করাটা সহ্য করেছেন বা না দেখার ভান করে থেকেছেন, সেগুলোও তুলে ধরা হয়েছে। আমরা দেখেছি কীভাবে রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা মেনে চলা (না মেনে চলা) নির্ধারিত হয়েছে। এ বিষয়ে মার্গারেট লেভির 'প্রয়োজনমাফিক সম্মতি' মডেলের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, যেখানে চিহ্নিত করা হয়েছে যে 'কিছু নীতি মেনে চলার কারণ হলো বলপ্রয়োগ বা অন্যান্য শাস্তি বা প্রণোদনা...কিন্তু কিছু নীতি মেনে চলার কারণ হলো নীতির যথার্থতায় বিশ্বাস করা এবং সরকারের যেসব ব্যক্তি সেসব নীতি বাস্তবায়ন করছে, তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা' (Levi 1997, 18)। আমরা বিশ্বাস করি, যেভাবে নাগরিকেরা অতিমারির ব্যাপারে সরকারি পদক্ষেপের কার্যকারিতা ও ন্যায্যতাকে বিবেচনা করেছে, সে বিষয়টি লকডাউনের নীতি মেনে চলা বা না চলা বুঝতে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যালিশা হল্যান্ডের 'বিরত থাকার' ধারণা বা 'আইনভঙ্গের ব্যাপারে সরকারের ইচ্ছাকৃত শিথিলতার' ধারণাও ধার করেছি (Holland 2016, 233)। এর মাধ্যমে বোঝা যাবে কেন বাংলাদেশ রাষ্ট্র লকডাউন ও সংশ্লিষ্ট নীতি বাতিল করে দেওয়ার পথ নিয়েছিল, যদিও এই নীতি বলবৎ করতে বলপ্রয়োগের সক্ষমতা সম্ভবত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ছিল। হল্যান্ডের 'বিরত থাকার' তত্ত্ব থেকে আমরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে সম্পূর্ণ অদক্ষতা বা অক্ষমতার বিশ্লেষণের বাইরে তাকাতে পারি; বিরত থাকা বা কিছু মানুষের নিয়ম ভাঙার ব্যাপারে বাছাই করা সহনশীলতা আসলে কিছু রাজনীতিবিদের একটি সক্রিয় ও ইচ্ছাকৃত কৌশল, অনেক সময় তা বণ্টনমূলক কৌশল। গুরুত্বপূর্ণ হলো, কিছু রাজনীতিবিদ অনেক সময় রাজনৈতিক বা কল্যাণমূলক কৌশল হিসেবে কেন নিয়ম ভাঙার বিষয়টি মেনে নেয়, তা বুঝতে পারলে আমরা

বুঝতে পারব যে নীতি বলবৎ করা গেলেই সেটা রাষ্ট্রীয় অক্ষমতা প্রমাণ করে না; বরং রাজনৈতিক অভিপ্রায়ও সেখানে থাকতে পারে।

বাংলাদেশ : 'শক্তিশালী সমাজে দুর্বল রাষ্ট্র'?

বিগত দশকগুলোয় বাংলাদেশের রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্ক নিয়ে যে পণ্ডিত ব্যক্তিরা কাজ করেছেন, তাঁদের পর্যবেক্ষণ হলো বাংলাদেশে সমাজের বিপরীতে রাষ্ট্র দুর্বল রয়ে গেছে (White 1999; Blair 1985)। এটি মিগডালের সক্ষমতা পরিমাপের পাল্লার নিচের দিকেই রয়ে গেছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করেছে রাষ্ট্র। কিন্তু সেগুলো দুর্বলভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে এবং একের পর এক আসা সরকারগুলোর খামখেয়ালির কাছে এসব সংস্কার বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সামাজিক সম্পর্ক এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্ষমতাও একই রকম দুর্বল রয়ে গেছে, যার প্রদর্শন দেখা যায় যৌতুক বা বাল্যবিবাহ বন্ধে অক্ষমতার বিষয়টিতে। নারী-পুরুষ সমতার মতো বিষয়গুলো ঘিরে যেসব মানব উন্নয়ন ঘটেছে, সেগুলো মূলত হয়েছে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলের কারণে। দৃষ্টিভঙ্গির এই বদল রাষ্ট্র অনুসরণ করেছে, নেতৃত্ব দেয়নি (Hossain 2017; Kabeer 2001)।

দুর্বল রাজস্ব আদায়ের প্রচেষ্টা থেকে গুরুত্বপূর্ণ রসদ আহরণে রাষ্ট্রের অদক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। দশকের পর দশক বাংলাদেশ রাষ্ট্র এর রাজস্ব আদায়ের হার এক গুণিতকের বাইরে বাড়াতে পারেনি (কর-জিডিপির অনুপাত), এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রমাগত সবচেয়ে খারাপ করেছে (Hassan and Prichard 2016)। কর আরোপে রাষ্ট্রের স্থানীয় সক্ষমতা বিশেষভাবে বর্ণনাযোগ্য। স্থানীয় কাউন্সিলররা গ্রামীণ না গরিকদের ওপর কর আরোপ করতে অনিচ্ছুক। কারণ, তাঁরা সম্পদ আহরণকারী শাসকের বদলে দয়ালু শাসকের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে চান। নির্বাচনী জনপ্রিয়তা ধরে রাখার কৌশল হিসেবে তাঁরা এটি করে থাকেন (Yunus and Rahman 2015; Ahmed 2020)।

তবে ধারাবাহিকভাবে আসা সরকারগুলো জীবিকার সংকট এবং জীবনের ওপর হুমকির মতো সংকটে বিপন্ন নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার প্রত্যাশা পূরণে চেষ্টা করেছে (Hossain 2017; 2018)। সংকটের সময় ক্ষমতাসীন এলিটদের ন্যায্য আচরণের ব্যাপারে বা একটি শক্তিশালী 'নৈতিক অর্থনীতির' ব্যাপারে একগুচ্ছ প্রত্যাশা তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় সরকারি নীতির রূপ দান করেছে, যদিও তা সাধারণত অদৃশ্য (Jahan and Hossain 2017; Jahan and Shahan 2016)। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বাকবদলের সময়ে জীবিকাসংকট এবং দুর্যোগের ভূমিকার অর্থ হলো জনগণের জীবিকার ওপর আসা আঘাতের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান। এই বিষয়টিই

বাংলাদেশে সামাজিক চুক্তির কাঠামো তৈরি করে দিয়েছে (Hossain 2017; 2018)। সে জন্য অর্থনৈতিক ও জনস্বাস্থ্যসংকটের সময় এই বিষয়টিরই রাষ্ট্রীয় বৈধতার মূল নিয়ামক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নির্বাচনী গণতন্ত্রে বাংলাদেশের উত্তরণ শুরু হয় ১৯৯০ সালে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংহত হওয়ার বদলে ২০১৪ সালের মধ্যে এমন এক রাজনৈতিক সমঝোতা জন্ম নেয়, যাকে কর্তৃত্বপরায়ণ ঘরানার প্রভুত্বশীল দলীয় রাষ্ট্র হিসেবে বর্ণনা করা যায় (Hassan and Raihan 2017)। বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় আসার পরপরই দলটি অন্তর্বর্তীকালীন একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের যে সাংবিধানিক বিধান ছিল, তা বাতিল করে দেয়। এরপর আওয়ামী লীগ দুটি নির্বাচনে জয় লাভ করে (২০১৩ ও ২০১৮)। দুটি নির্বাচনই দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকেরা প্রচণ্ড কারচুপি হয়েছে বলে মনে করেন (Riaz 2019; ICG 2015)। বর্তমান সরকারের ধরনকে কার্যত পার্টি স্টেট বা দলীয় রাষ্ট্র হিসেবে বর্ণনা করা যায়, যেখানে সমাজে গভীরভাবে জেঁকে বসা পার্টি বা দল জাতীয় ও স্থানীয় আমলাতন্ত্র, নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের মতো রাষ্ট্রীয় অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। করোনাভাইরাস-সম্পর্কিত ত্রাণ কার্যক্রমের শাসনব্যবস্থা বিষয়ে আমাদের পরবর্তী আলোচনায় এই প্রভুত্ব বিস্তারের প্রভাব বর্ণনা করা হবে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে শ্রেণিভিত্তিক রাজনীতি ও দল প্রায়-অনুপস্থিত—বামপন্থী দলগুলোর অবস্থান অত্যন্ত দুর্বল, কৃষকশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করার মতো কোনো দল নেই এবং শিল্পভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অবস্থাও সঙিন এবং বহুলাংশেই এগুলো ক্ষমতাসীন দলের অধীন হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপিই হলো 'ক্যাচ-অল' পার্টি বা সব শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী দল। তারাই জাতীয় দলীয় রাজনীতিতে প্রভুত্ব বজায় রাখে। যদিও তাত্ত্বিকভাবে দুটো দলই বিভিন্ন শ্রেণির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু বাস্তবে তারা শুধু এলিট অংশের মধ্যেই আবদ্ধ। এলিট শ্রেণির প্রতি এই পক্ষপাত সম্প্রতি আরও জোরদার হয়েছে; কারণ, ব্যবসায়ী এলিটরা দৃঢ়ভাবে নির্বাচনী রাজনীতি এবং রাষ্ট্রীয় নীতিপ্রণয়ন প্রক্রিয়া—দুটোরই দখল নিয়েছে। ব্যবসায়ী শ্রেণির মধ্যে আবার তৈরি পোশাক খাতের কারখানামালিকদের আধিপত্য রয়েছে। কারণ, পোশাক কারখানার মালিকদের বিদেশি মুদ্রা আয়ের ওপর সামষ্টিক ক্ষমতা রয়েছে এবং জনকর্মসংস্থান তৈরির ক্ষমতা রয়েছে। এ ছাড়া দলীয় রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় অর্থায়ন করার ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা রয়েছে (Hassan and Raihan 2017)।

সাম্প্রতিক দশকগুলোয় নাগরিক সমাজের পরিসরও ছোট হয়ে এসেছে। এটি ঘটার পেছনে শক্তি জুগিয়েছে যে বিষয়টি, তা হলো নাগরিক ও পেশাগত সংগঠনগুলোর ওপর ক্ষমতাসীন এলিটদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ, যার বৈশিষ্ট্য হলো বেসরকারি সংগঠনগুলোর

(এনজিও) স্বনিয়ন্ত্রণ চর্চা এবং দানবীয় আইন ও সাংবাদিকদের অপরাধী সাব্যস্ত করার মাধ্যমে গণমাধ্যমের ওপর আরও বেশি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। বস্তুত, এসব দানবীয় আইন করোনাভাইরাসের প্রেক্ষাপটেও সাংবাদিক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে, যাঁরা লকডাউন, স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সেবা এবং ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অদক্ষ ও অস্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো ফাঁস করে দিয়েছেন (Amnesty International 2020)। মূল কথা হলো, এসবের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সমাজে যারা এলিট নয়, তাদের কোনো পাল্টা ক্ষমতা নেই। এসবের বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজেরও পাল্টা ক্ষমতা নেই। এই নিবন্ধে আলোচনা করা হবে, ক্ষমতার এই ধরনের ভারসাম্যহীনতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাষ্ট্রের প্রণোদনা ও আচরণের রূপ তৈরি করে দিয়েছে। এর ফলে লকডাউন এবং এ বিষয়ে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার কৌশল ব্যবস্থাপনা করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্ষমতাও নির্ধারিত হয়েছে ক্ষমতার এই ভারসাম্যহীনতার মাধ্যমে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বপরায়ণ চেহারা থেকে 'স্বৈরাচারী' রাষ্ট্রের লক্ষণ পাওয়া যায়, অর্থাৎ স্বৈরাচারী বলতে মাইকেল ম্যান যেমনটি বুঝিয়েছেন। বিষয়টি আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মনে হতে পারে যে সামাজিক শক্তিগুলোর কাছ থেকে রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা রয়েছে। এই মনে হওয়াটা ভুল। রাষ্ট্র দৃঢ়ভাবে অর্থনৈতিক এলিটদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রণয়নের জায়গায় এর দর-কষাকষির সুযোগ হারিয়ে গেছে। রাষ্ট্রের চিত্রায়ণ আরও বেশি বাস্তবসম্মত ও সূক্ষ্মভাবে করলে এটিকে নমনীয় কর্তৃত্বপরায়ণ মনে হবে, যার তুলনামূলক কম স্বৈরাচারী ক্ষমতা রয়েছে। তবে 'গুম' ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের আগ্রাসী অভিযানের মাধ্যমে সরকার রাজনৈতিক সমাজে বিরোধী দলকে এবং নাগরিক সমাজে ভিন্নমতাবলম্বীদের (বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী) যেভাবে দমন করে, তাতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এই ধরনের নমনীয় কর্তৃত্বপরায়ণ চিত্রায়ণকে সাধারণ বোধবুদ্ধিবিরোধী মনে হবে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, জনগণের স্বার্থ ও প্রত্যাশা মেটাতে নিয়ম ভাঙা সহ্য করা এবং যখন নীতি-নির্ধারকরা ব্যাপকভাবে অজনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তখন নতুন নীতি নিয়ে হাজির হওয়া বিবেচনা করলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র নমনীয় কর্তৃত্বপরায়ণ। লকডাউন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনায় দেখা যাবে যে লকডাউনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আচরণের বৈশিষ্ট্য হলো দ্বিধা, অসামঞ্জস্যতা এবং বিপরীতমুখীনতা।

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে (নমনীয়) কর্তৃত্বপরায়ণবাদ সত্ত্বেও বর্তমান সরকার বেশির ভাগ জনগণের কাছে ব্যাপকভাবে বৈধ। এর কারণ হলো, এই সরকারের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যদক্ষতা (Meisburger 2017; Taylor, Tweedie, and Shawkut 2018; TAF and BIGD 2019)। এসব প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকদের প্রত্যাশা ও দাবিদাওয়া

বেশি পূরণ হয় অর্থনৈতিক অধিকার মেটানোর সক্ষমতায়। কিন্তু সংগঠনের স্বাধীনতা বা বাক্‌স্বাধীনতার মতো অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে তা কম পূরণ হয়। জনগণ মোটা দাগে রাষ্ট্রকে তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে দেখার চেয়ে দয়ালু পৃষ্ঠপোষক-রাষ্ট্র এবং দাতা/রক্ষাকর্তা হিসেবে মনে করে। জনগণের এসব প্রত্যাশা ও উপলব্ধি রাজনৈতিক এলিটদের রাডারে ধরা পড়ে। যেমন বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি মন্তব্য করেন,

> যদি আমি খাদ্য, চাকরি এবং স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারি, সেটাই মানবাধিকার...বিরোধী দল, নাগরিক সমাজ বা আপনাদের এনজিও যা বলছে, আমি সেসব বিবেচনায় নেই না। আমি আমার দেশকে চিনি। আমি জানি কীভাবে আমার দেশকে উন্নত করতে হবে (Abi-Habib and Manik 2018)।

জনগণের প্রত্যাশা ও ধারণার ব্যাপারে সচেতন হওয়ায় রাষ্ট্রের এলিটরা গরিবদের মৌলিক কল্যাণমূলক চাহিদাগুলো নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন, বিশেষ করে জীবিকার সংকটের কালে। গণতান্ত্রিক, বিশেষ করে নির্বাচনী বৈধতার ঘাটতি থাকায় (বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং শহুরে ও গ্রামীণ শিক্ষিতদের মধ্যে) রাজনৈতিক এলিটরা ইতিবাচক স্বাধীনতা (অর্থনৈতিক কল্যাণ, দারিদ্র্য বিমোচন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি) নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাঁদের বৈধতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে তাঁরা আমজনতার দাবিদাওয়ার প্রতি বিশেষ সংবেদনশীল।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার ধরন বিবেচনায় নিয়েই গবেষণার প্রাথমিক নকশা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো লকডাউনে নাগরিক-রাষ্ট্র সম্পর্কের গতিশীলতা বুঝতে পারা।

গবেষণা পদ্ধতি

করোনাভাইরাস অতিমারি ও লকডাউনে পদক্ষেপ গ্রহণে কমিউনিটির গতিশীলতার কেস স্টাডি তৈরি করতে এই নিবন্ধের জন্য পরিচালিত গবেষণার নকশা করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল নীতি বিষয়ে আনুগত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আস্থা ও মেনে চলার বিষয়গুলো উদ্‌ঘাটন করা। গবেষণা দল প্রথমে প্রতিটি নির্বাচিত স্থানে কাজ করে স্থানীয় মূল তথ্যদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এরপর সেই এলাকার ইতিহাস, অর্থনীতি, সামাজিক কাঠামো এবং মূল ব্যক্তিদের যোগাযোগ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করেছে। এই নিবন্ধে ছয়টি জেলায় ছয়টি স্থানে কমিউনিটির কেস স্টাডির ফলাফল ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো নির্বাচন করা হয়েছিল যেন বিভিন্ন ধরনের সামাজিক পরিস্থিতিতে লকডাউন ও করোনাভাইরাসবিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণের অভিজ্ঞতার একটি বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যায়। গবেষণা এলাকায় বসতির ধরন ছিল নিম্নোক্ত,

- গ্রামীণ হাওর এলাকা (নিচু জলাভূমি), ব্যাপকভাবে কৃষিভিত্তিক, কিন্তু জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ ঢাকা ও আশপাশের পোশাকশিল্প কারখানায় কাজ করে।

- গ্রামীণ উপকূলীয় এলাকা, যেখানে উচ্চমাত্রার লবণাক্ততা রয়েছে। বছরে একবার শস্য হয় এবং ছয়টি এলাকার মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র।
- বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মফস্বল এলাকা, যেখানে অর্থনীতি নির্ভর করে রাজধানী শহরে সবজি বিক্রির ওপর এবং কিছুটা পোশাক কারখানায় কাজের ওপর।
- পশ্চিমাঞ্চলের মফস্বল এলাকা, যেখানে বাণিজ্যিকভাবে আম উৎপাদন এবং ধান চাষ হলো প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।
- ঢাকার নিকটবর্তী বড় শিল্প এলাকা, যেখানে ছোট শিল্প উদ্যোক্তা এবং বিশেষ করে ছোট পোশাক কারখানা রয়েছে।
- রাজধানী শহরের প্রাণকেন্দ্রে অপ্রাতিষ্ঠানিক বসতি।

মুঠোফোনের মাধ্যমে মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। মোটামুটি ৬০ মিনিটের একটি আধা কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকারের প্রশ্নমালা ছিল। মূল তথ্যদাতাদের বাছাই করার ক্ষেত্রে স্নোবল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের বাছাই করা হয়েছিল নির্দিষ্ট পেশা ও সামাজিক বর্গ থেকে। উদ্দেশ্য ছিল প্রভাবশালী লোকদের কাছে পৌঁছানো এবং সেসব লোকের কাছে পৌঁছানো, যাদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও অবস্থার কারণে তারা বিপন্ন বা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংকটের ব্যাপারে নির্দিষ্ট অন্তর্দৃষ্টি পেয়েছে। যাদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাঁরা হলেন, ক) কমিউনিটির নেতা বা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি; খ) শিক্ষক, এনজিওকর্মী এবং আনুষ্ঠানিক খাতের কর্মী; গ) ছোট কৃষক ও স্থানীয় ব্যবসার মালিক; ঘ) সম্মুখসারির স্বাস্থ্যসেবা কর্মী; ঙ) ছোট বাচ্চাদের মা; চ) দিনমজুর (কৃষিশ্রমিক, পরিবহনশ্রমিক); ছ) শিক্ষার্থী; জ) ইমাম বা ধর্মীয় নেতা; ঝ) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য; এবং ঞ) সরকারের ত্রাণ পাওয়া ব্যক্তি। প্রতিটি স্থানে ৭ থেকে ১০ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। মুঠোফোনের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সেখানে অবস্থিত পরিচিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে এসব সাক্ষাৎকার আগে থেকে ঠিক করা হয়েছিল। একই গবেষণা এলাকায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপট, পেশা এবং আর্থসামাজিক শ্রেণি থেকে একাধিক তথ্যদাতা থাকায় তাদের এলাকার মধ্যে ঘটা ঘটনা ও ধারণার ব্যাপারে প্রাপ্ত ফলাফল মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়।

উপাত্ত সংগ্রহে সীমাবদ্ধতা থাকলে তা পরিমাপেও সীমাবদ্ধতা থাকে, যদিও কমিউনিটির কেস স্টাডি থেকে বাছাইকৃত স্থানগুলোতে অতিমারির গতিশীলতা বিষয়ে সমৃদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়, কিন্তু কোন মাত্রায় এসব গতিশীলতা উপস্থিত, তা বোঝা যায় না। তা ছাড়া এই গবেষণায় নির্দিষ্টভাবে নৃতাত্ত্বিক বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী কিংবা স্থানও খতিয়ে দেখা হয়নি। যেসব কমিউনিটির ওপর গবেষণা করা হয়েছে, তারা প্রধানত মুসলিমপ্রধান। পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি খুব বেশি উঠে এসেছে; ৯২টি

সাক্ষাৎকারের মধ্যে মাত্র ২০টি ছিল নারী। সবশেষে, সবচেয়ে গরিব বা সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বদলে কমিউনিটির প্রভাবশালী বা কর্তৃত্ব রয়েছে এমন লোকদের ইচ্ছাকৃতভাবে বেশি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এর কারণ হলো যেসব লোকের উচ্চপর্যায়ের সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে, এবং ঘটনা সম্পর্কে তথ্য জড়ো করার অধিক ক্ষমতা রয়েছে, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া গেছে। গবেষণা পদ্ধতির সুবিধার মধ্যে ছিল কমিউনিটির একই সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘদিনব্যাপী বা একাধিকবার সাক্ষাৎকার নেওয়া গেছে। এর ফলে প্রতিটি স্থানে পরিবর্তনের দিকনির্দেশনার একটি সামঞ্জস্য চিত্র পাওয়া গেছে।

মুঠোফোনে নেওয়া সাক্ষাৎকারগুলো সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর অনুমতি নিয়ে মুঠোফোন রেকর্ডারে ধারণ করা হয়েছিল। এরপর গবেষকেরা সেগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। দুই দফায় সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। প্রথম দফা নেওয়া হয়েছিল ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। দ্বিতীয় দফা নেওয়া হয় ২০২০ সালের মে মাসের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহব্যাপী (রমজান মাসের শেষ সপ্তাহ এবং এরপর মে মাসের ২৪ তারিখ ছিল ঈদুল ফিতর)।

৩. গবেষণার ফলাফল

বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু নীতি-পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এগুলোর মধ্যে ছিল করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণ, টেস্ট করানো, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, কর আরোপ ও শিল্পভিত্তিক কৌশল এবং কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধক ত্রাণ পদক্ষেপ। সরকারের অতিমারিবিষয়ক নীতি বুঝতে পারলে এসব নীতির আওতা ও মাত্রাও বোঝা যায়। এসবের ভিত্তিতে দেখলে, এই অঞ্চল বা তার বাইরেও অন্যান্য দেশ যেসব নীতি-পদক্ষেপ নিয়েছে, তার সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের নীতি-পদক্ষেপের মিল রয়েছে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা এবং যতগুলো খাত ও যে পরিমাণ মানুষকে রাষ্ট্র প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছে, দুটোর ক্ষেত্রেই এসব নীতি-পদক্ষেপ অন্য দেশগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (see Hale et al. 2020)। কিন্তু এসব পদক্ষেপের তালিকা থেকে আমরা এসব নীতি গ্রহণের পেছনে রাজনীতি বা কারা এসব নীতির সমর্থন জুগিয়েছিল, তার কোনোটিরই উত্তর পাব না (Capano et al. 2020)। সে জন্য, আমরা বুঝতে পারব না যে কেন এসব নীতি যত দিন টিকে থাকা দরকার, তত দিনই শুধু ছিল, কিংবা কেন একটি জনস্বাস্থ্য বিপর্যয় বিলম্বিত করা গিয়েছিল। মহামারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। এর ফলে 'অতিমারি নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান ব্যবস্থার সক্ষমতার ব্যাপারে' বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের 'আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি থাকা ছিল খুবই স্বাভাবিক' (Capano et al. 2020, 299)। এসব পরিস্থিতির ফলেই নীতি গ্রহণ হয়েছে বাছাইকৃত এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলো বাতিলও হয়ে যায়।

লকডাউন আরোপ এবং তুলে নেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অসম ও তাৎক্ষণিক পদ্ধতিতে। তবে এ বিষয়ে সমালোচনাটি বাংলাদেশের চেয়ে আরও অনেক বেশি সক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য (Capano et al. 2020)। মার্চ মাসের ২৪ তারিখে সরকার ১০ দিনব্যাপী সারা দেশে 'সাধারণ ছুটি' ঘোষণা করে। এই ছুটি মার্চ মাসের ২৬ তারিখে শুরু হয়। এর মাধ্যমে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, কর্মসংস্থান এবং গণপরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সেনাবাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে শহর থেকে বিপুল মানুষের গ্রামমুখী ঢেউ শুরু হয়, যদিও ভারতের মতো এখানে অভিবাসী শ্রমিকদের ব্যাপারে দৃঢ় কোনো নীতি ছিল না। পুনঃপুন নীতি বদলের মুখে এই অভিবাসী শ্রমিকদের নিজেদের বন্দোবস্ত নিজেদেরই করতে হয়েছিল। এপ্রিলের শুরুর দিকে কোনো প্রকার গণবিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সরকার একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত জারির মাধ্যমে স্থানীয় কর্মকর্তাদের ক্ষমতা প্রদান করে, যেন তারা মানুষকে ঘরে থাকার নিয়ম বলবৎ করতে পারে। এই কাজে পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। সেনাবাহিনীকে অল্প সময়ের জন্য মোতায়েন করে এরপর তুলে নেওয়া হয়। দেশব্যাপী 'সাধারণ ছুটির' মেয়াদ সাতবার বৃদ্ধি করে মে মাসের ৩১ তারিখ পর্যন্ত চলে। এই সময়ের মধ্যে রমজান মাস ও ঈদুল ফিতর পড়ে যায় (২৩-২৪ মে)। ইতিমধ্যে লকডাউনের নিয়ম নিয়ে চলতে থাকে উলটপালট। নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়, যেমন বোরো ধান কাটার অনুমতি দেওয়া হয়, সামাজিক দূরত্ব মেনে মসজিদে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে দেওয়া হয়, ইফতারি বিক্রির জন্য রেস্তোরাঁগুলোকে অনুমতি দেওয়া হয় এবং পোশাক কারখানা ও দোকানপাট পুনরায় খোলার অনুমতি দেওয়া হয়। এপ্রিল ও মে মাসের শুরুর সময়ে সরকারি ঘোষণা ছাড়াই ধীরে ধীরে পুলিশ উঠিয়ে নেওয়া হয় নীরবে। ২০২০ সালের ২৮ মে সরকার নতুন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এর মাধ্যমে সরকারিভাবে 'সাধারণ ছুটি' সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়, অফিস, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং গণপরিবহন পুনরায় খোলা হয়, তবে যেখানে প্রয়োজন সেখানে সামাজিক দূরত্বের বিধি মেনে চলার কথা বলা হয়।

সরকার যখন শুরুতে তীব্র ও জোর করে সামাজিক দূরত্ব বিধি বাস্তবায়ন করা শুরু করল, সেটি 'লকডাউন' নামে পরিচিতি পেল। সে সময় প্রথম দফা সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে (এপ্রিল ৪-১৪)। আধা শহুরে একটি গবেষণা স্থানে, স্থানীয় সরকারের একজন সদস্য সাক্ষাৎকারের দিনেই কঠোর লকডাউন আরোপের আদেশ পায় (এপ্রিল ১১)। গ্রামীণ হাওর এলাকাই একমাত্র এলাকা, যা তখনো কঠোর লকডাউনের আওতায় যায়নি। পোশাক কারখানার কর্মীরা জনশ্রুতি শোনেন যে ঢাকা ও গাজীপুরে কারখানা পুনরায় খোলা হবে। এটি শুনে তাঁরা চরম দুর্দশার মধ্য দিয়ে শহরে গিয়ে আবার নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। এর পরপরই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। লকডাউন

শিথিল করার পরপরই দ্বিতীয় দফা সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে (মে ১১-১৩)। সাক্ষাৎকারদাতারা জানান যে সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে দোকানপাট খোলার ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় মে মাসের ৯ তারিখে। এটি ছিল লকডাউন সমাপ্তি হওয়ার চূড়ান্ত সংকেত। সাক্ষাৎকারদাতারা জানান যে লকডাউনের কড়াকড়ি পর্ব শেষ হয় ১৫ থেকে ২০ দিন আগেই, যখন পুলিশ উঠিয়ে নেওয়া হয়। এর মাধ্যমে এই পর্ব দুই সপ্তাহের মতো ছিল, এপ্রিল মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

লকডাউন

সাক্ষাৎকারদাতাদের লকডাউনের অভিজ্ঞতা হলো প্রায় বিরামহীন মাইকিং করে ঘরে থাকতে বলা, হাত ধোয়া, সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করা এবং ভিড় এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রাস্তা ও বাজারগুলোয় পুলিশ এবং শুরুতে সেনাবাহিনীর টহল দেওয়া। পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় যেন বেলা দুইটার পর রাস্তা খালি করা হয় এবং অনুমতিপ্রাপ্ত দোকানপাট ছাড়া বাকি সব বন্ধ করা হয়। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা পুলিশকে সহায়তা করেছে। উপকূলীয় গ্রামীণ এলাকায় গ্রাম পুলিশ এবং ‘চেয়ারম্যানের লোকদের’ (রাজনৈতিক নেটওয়ার্ক ও অনুসারী) সহায়তায় স্থানীয় সরকার গ্রামের অভ্যন্তরের রাস্তাঘাট পাহারা দিয়েছে। অন্যদিকে পুলিশ টহল দিয়েছে বাজার, হাইওয়ে এবং নদীর ঘাট। ঢাকার বস্তিতে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা সম্মানিত মুরুব্বি এবং ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সম্পর্কিত তরুণ স্বেচ্ছাসেবীদের চিহ্নিত করে দিয়েছেন। তারাই বস্তির ভেতরে পাহারা দিত, আর পুলিশ থাকত মূল সড়ক ও বাজারে। আধা শহুরে এলাকায়, জেলা পর্যায়ের আমলা এবং পুলিশ মিলে বাজার ও জনসমাগম স্থানে নিয়মিত বিরতিতে পরিদর্শন চালিয়েছে। এভাবেই সরকার প্রত্যক্ষ (পুলিশ ও জেলা প্রশাসন) ও পরোক্ষভাবে (ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সম্পর্কিত তরুণ স্বেচ্ছাসেবীরা) উল্লেখযোগ্য বলপ্রয়োগের সক্ষমতা জুগিয়ে লকডাউন আরোপ করে।

পুলিশ নিজের বলপ্রয়োগের মাধ্যমে লকডাউন কার্যকর করেছে। লকডাউনের কথা বলতে গিয়ে সাক্ষাৎকারদাতারা পুলিশের ভূমিকার কথা বলেছেন। মফস্বল এলাকার একজন হস্তশিল্পশ্রমিক ‘পুলিশ লাঠি হাতে মানুষকে তাড়া করার’ দৃশ্যের কারণে সৃষ্ট ভয়ের কথা জানান। ঢাকায় বস্তির একজন সাক্ষাৎকারদাতা জানান যে ‘আমার জীবনে প্রথমবারের মতো সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের গাড়ি ঢুকতে দেখেছি।’ বহু সাক্ষাৎকারদাতা, বিশেষ করে চায়ের দোকানদার, রিকশাচালক ও দিনমজুরেরা বাজারে পুলিশের সামনে ধরা পড়ে যাওয়ার কথা জানান। এটি ঘটে যখন পুলিশ দোকান বন্ধ করে দিচ্ছিল। এ ছাড়া মূল সড়কেও পুলিশ তাঁদের লাঠি উঁচিয়ে ধাওয়া দিয়েছিল। রিকশাচালকেরা জানান যে পুলিশ তাঁদের রিকশা আটকে রেখেছে অথবা

টায়ার ফুটো করে দিয়েছে। শহরের দিনমজুরেরা জানান যে তাঁরা বাইরে যাওয়ার ফলে পুলিশ 'দু-একটা লাঠির বাড়ি' দেয়। মফস্বল এলাকার বহু সাক্ষাৎকারদাতা জানান যে বাজারে যেসব দোকানপাট খোলা পেয়েছে, তাদের কাছ থেকে বিপুল জরিমানা আদায় করা হয়েছে (৫ থেকে ১০ হাজার টাকা)।

শুরুতে লকডাউন ও পুলিশি পদক্ষেপের ব্যাপারে জোরালো সামাজিক সমর্থন ছিল। এটিকে মার্গারেট লেভির ভাষায় বলা যায় 'আধা স্বেচ্ছা মেনে চলা' (১৯৯৭)। এর ভিত্তি ছিল জনসম্মতি, ভাইরাসের ভয় এবং শুরুতে অনেকেরই সঞ্চয় ছিল খাওয়ার মতো। সাক্ষাৎকারের প্রথম দফায় 'লকডাউন প্রয়োজনীয়' হিসেবে বারবার ব্যক্ত হয়েছে। সামাজিক সমর্থনের উৎস ছিল ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্ক। এই আতঙ্ক তৈরি হওয়ার কারণ হলো টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া আক্রান্ত ও মৃত্যুর ব্যাপারে আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় সংবাদ। উপকূলীয় গ্রামীণ এলাকার একজন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক সংবাদ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং কমিউনিটি আতঙ্কের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করেন,

> মানুষ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর চেয়ে ভাইরাসকে বেশি ভয় পায়। কারণ, তারা ফেসবুক, ইউটিউব এবং বাংলাদেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশের খবর দেখছিল। তারা দেখতে পায় যে বিশ্বের উন্নত দেশেই হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। তাই তারা ভয় পায় যে সেসব উন্নত দেশেই যদি এই ভাইরাস এত ধ্বংস সাধন করতে পারে, তাহলে বাংলাদেশে একবার তা ছড়িয়ে পড়লে না জানি কী পরিণতি হবে?

সাক্ষাৎকারদাতারা অতিমারিবিষয়ক জাতীয় ও স্থানীয় খবর দেখেছে। প্রথম দফা সাক্ষাৎকার শুরু হয় যখন সরকার টেস্টের সংখ্যা বাড়ানো শুরু করে এবং আক্রান্তের খবর জানাতে থাকে, এপ্রিলের ৯ তারিখে টেস্টের সংখ্যা প্রতিদিন ১ হাজার ছাড়ায় এবং বাংলাদেশে প্রথম ১ হাজার শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ এপ্রিল। শহুরে শিল্প এলাকায় একজন ব্যবসায়ী জানান যে তাঁদের কমিউনিটিতে মানুষ সরকারের টেস্ট পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের দেওয়া দৈনিক ব্রিফিং বিশ্বাস করেছে। ঢাকার বস্তিবাসীরা শনাক্তের ঘটনার ব্যাপারে পার্শ্ববর্তী এলাকার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে যা শুনেছে, তা শুরুর দিকে হটস্পট হিসেবে মনে হয়েছে। মফস্বল এলাকায় একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি কমিউনিটির আতঙ্কের কথা বলতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের একটি ঘটনার উদাহরণ দেন। সেখানে একজন নারী আমেরিকা থেকে ফিরে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এর দুই দিন পর তাঁর করোনা ধরা পড়ে। গ্রামীণ হাওর এলাকায় একাধিক সাক্ষাৎকারদাতা জানান যে যখন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একজন নার্সের করোনা ধরা পড়ে, তখন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা এটিও জানান যে যখন পরবর্তী পরীক্ষায় সেই নার্সের করোনা আর ধরা পড়েনি, তখন আতঙ্ক উবে যায়।

আতঙ্কের কারণে লকডাউন বিধির ব্যাপারে বৃহত্তর সমর্থন তৈরি হয়। কিন্তু আশু জীবিকাসংকটের শর্তাধীন ছিল এই সমর্থন। উপকূলীয় গ্রামীণ এলাকার একজন কৃষিশ্রমিক জানান যে 'যদি এই লকডাউন চলতে থাকে, তাহলে করোনায় মরার আগে না খেয়ে মারা যাব।' ছয়টি গবেষণাস্থলেই রিকশাচালক, চায়ের দোকানদার, নির্মাণশ্রমিক, পোশাক কারখানার কর্মী, কৃষিশ্রমিক এবং গৃহকর্মীরা জীবিকার ওপর লকডাউনের প্রভাব বিষয়ে একই রকম বর্ণনা দিয়েছেন। লকডাউন মেনে চলার বিষয়টি জীবিকার ওপর নির্ভরশীল ছিল। রহমান ও মতিন দেখিয়েছেন যে এসব পেশার মানুষদের আয়রোজগার ব্যাপকভাবে কমে গিয়েছিল বা সম্পূর্ণরূপে উবে গিয়েছিল। তাঁরা খাবারের পরিমাণ ব্যাপক মাত্রায় কমিয়ে দিয়ে, সঞ্চয় ভেঙে এবং পরিচিতজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বেঁচে ছিল (Rahman and Matin 2020)। মানুষ তাঁদের আয়রোজগারের সঙ্গে মানিয়ে চলছিল—রিকশাচালক, ভ্যানচালক এবং কুলিরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবজি ও মাছ-মাংস বিক্রি করেছেন; চায়ের দোকানদারেরা খুচরা সবজি বিক্রি শুরু করেছেন; এবং কৃষিশ্রমিকেরা নিজ বাড়িতে সবজি চাষ এবং গ্রামের পুকুরে মাছ ধরা শুরু করেন।

গবেষণা এলাকাগুলো এবং বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি থেকে উত্তরদাতারা দুই দফা সাক্ষাৎকারের সময়ই জানান যে ক্ষুধার্ত মানুষ লকডাউন মেনে চলতে পারবে না। ছয়টি কমিউনিটির মানুষই জানায় যে 'মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় নিজ বাড়ি ছেড়ে খাবার বা কাজের সন্ধানে বের হবে'। বহু উত্তরদাতা জানান যে লকডাউন তখনই কার্যকর করা যাবে, যদি গরিব ও ক্ষুধার্ত মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করে সরকার। লকডাউন বিধির ন্যায্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং এর সঙ্গে লকডাউনের বাস্তবায়নযোগ্যতাও। অন্য কথায় বলতে গেলে, নাগরিকদের লকডাউন মেনে চলা নির্ভর করে কার্যকর ও ন্যায্য ত্রাণ বিতরণের ওপর, যা লকডাউনের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারবে (Levi 1997)।

ত্রাণ প্রত্যাশা

অতিমারি ও লকডাউনের কারণে জোরালো প্রত্যাশা তৈরি হয় যে সরকার নাগরিকদের খাওয়ানোর মতো যথেষ্ট পদক্ষেপ নেবে। শহুরে শিল্প এলাকার একজন নির্মাণশ্রমিক জানান যে 'সরকারের উচিত কার বাড়িতে কত খাবার আছে, সেসব নিয়ে চিন্তা না করে সবার বাড়ি বাড়ি খাবার পাঠানো।' ঢাকায় বস্তির একজন কমিউনিটি নেতা ও শ্রমিকনেতা জানান, 'এই রকম পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত সব পরিবারকে এক মাস খাওয়ানো।' একাধিক উত্তরদাতা মনে করেন, যে পরিমাণ ত্রাণ দরকার ছিল, তাতে লকডাউন কার্যকর করতে হলে একমাত্র সরকারই পারে ব্যাপক আকারে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণসহায়তা দিতে।

এসব প্রত্যাশা তৈরি হওয়ার কারণ হলো সরকারের ঘোষিত ত্রাণ প্যাকেজ। প্রথম দফার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল ৫ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী ৭২৫ বিলিয়ন টাকার অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণার পরে। বেশির ভাগ প্রণোদনাই ছিল বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ভর্তুকির মাধ্যমে দেওয়া ঋণসহায়তা। এর মাধ্যমে মূলত পোশাক কারখানার মালিকেরা লাভবান হয়েছেন। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী সামাজিক নিরাপত্তা জাল বাড়ানোর ঘোষণা দেন। বিনা মূল্যে খাদ্যসহায়তা, ১০ টাকা কেজি ভর্তুকি দেওয়া চালের সংস্থান এবং বয়স্ক ও বিধবা ভাতার আওতা বাড়ানোর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা জাল বাড়ানোর কথা বলা হয়েছিল। দ্বিতীয় দফা সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল যখন ঘোষণা আসে যে ৫০ লাখ পরিবারকে আড়াই হাজার করে টাকা দেওয়া হবে মুঠোফোনের আর্থিক সেবার মাধ্যমে এবং তা ঈদের আগেই। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ১৪ মে প্রধানমন্ত্রী নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন, যেদিন সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ হয়েছিল। যদিও ত্রাণের এসব প্রতিশ্রুতির ফলে প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু গণমাধ্যমে ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতির খবর আসতে থাকার ফলে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। বেশ কিছু উত্তরদাতা টেলিভিশন বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসা খবরের বরাতে জানায় যে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা ত্রাণের চাল নিয়ে ধরা পড়েছেন এবং রাজনৈতিক যোগাযোগ থাকা মানুষদের কাছেই ত্রাণ যাচ্ছে। এসব ভাবমূর্তি তৈরি হওয়ার কারণে আগে থেকে আশঙ্কা ছিল যে ত্রাণ বিতরণ আশানুরূপ কার্যকর হবে না, সেটিই আরও দৃঢ় হয়। কারণ, রাজনীতিবিদেরা নিজেদের সমৃদ্ধ করতে চান অথবা নিজেদের অনুসারীদের সুবিধা দিতে চান। তাত্ত্বিকভাবে শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রণোদনা প্যাকেজে মূলত শ্রমিক এবং অন্যান্য শিল্পের চেয়ে পোশাক কারখানার মালিকদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে করা হয়েছিল। এর ফলে অন্যায্যতার বোধ আরও জোরালো হয় (Sultan et al. 2020)। এসব কারণে যে বোধটি জোরালো হয়, তা হলো অতিমারি ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা বহন করতে হবে সেই জনগোষ্ঠীকে, যাদের তা করার সক্ষমতা সবচেয়ে কম। এর ফলে সরকারের পদক্ষেপের ন্যায্যতা ও কার্যকারিতার ব্যাপারে যে উপলব্ধি ছিল, তা নষ্ট হয়ে যায়।

জনপ্রত্যাশার নজর ছিল ‘প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণে’। বেশ কয়েকজন স্পষ্টতই তাঁদের প্রত্যাশার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির যোগসূত্র তৈরি করেন। একজন খুচরা ইলেকট্রনিক পণ্য বিক্রেতা বিপদে পড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য দেওয়া এই বিচক্ষণ ত্রাণের প্রতিশ্রুতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে। কারণ, মধ্যবিত্তরা সাহায্য চাইতে পারে না। ঢাকায় বস্তিতে বসবাস করা একজন ইটভাটার কর্মী জানান যে প্রধানমন্ত্রী বাড়িওয়ালাদের বলেছেন যেন এক মাসের ভাড়া মওকুফ করে দেন। অনেক উত্তরদাতা প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সঙ্গে প্রকৃত বিতরণকৃত ত্রাণের অভাবের তুলনা করেছেন।

শহুরে শিল্প এলাকার একজন কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনের স্থানীয় নেতা বলেন,

> প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সবার বাড়িতে খাবার পাঠানোর, কিন্তু কেউ এখন পর্যন্ত খাবার পায়নি। আমরা কমিশনারের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন যে সরকার এখনো কিছু দেয়নি। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ সরকারের ওপর আস্থা হারাচ্ছে, এমনকি প্রধানমন্ত্রীর ওপরও।

এসব প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি এবং অনিশ্চয়তার মধ্যেই অনেক মানুষ, যাঁদের জীবিকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তাঁরা সরকারের ত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। ত্রাণের তালিকায় নাম ওঠাতে মানুষ তাঁদের ঘনিষ্ঠ নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি অথবা (শহুরে এলাকায়) স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের কাছে গেছেন। একজন পোশাককর্মী বলেন, 'অভাবে থাকা গরিব মানুষেরা বাড়িওয়ালা, এলাকার কাউন্সিলর, নারী কাউন্সিলর, দলীয় নেতাদের শরণাপন্ন হয়েছে। তারাই তালিকায় নাম দেওয়ার কাজটি করে।' ত্রাণ পাওয়ার তালিকা তৈরি করাকে ঘিরে স্থানীয় রাজনীতির বিষয়টি সরকারি ত্রাণব্যবস্থার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

ত্রাণব্যবস্থা

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই মানুষজন স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের কাছে সরকারি ত্রাণের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে থাকে। উপকূলীয় গ্রামীণ এলাকায় ১০-১৫ জনের একটি দল ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে চেয়ারম্যানের কাছে খাবার চায়। একজন কৃষিশ্রমিক জানান, চেয়ারম্যান তাঁদের ফেরত পাঠান এই বলে যে তিনি তখনো সরকারের কাছ থেকে কিছু পাননি। মফস্বল এলাকায়, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জানান যে ৫০ থেকে ৬০ জন লোক প্রতিদিন তাঁর কাছে আসতেন ত্রাণের খোঁজে এবং প্রায় সমপরিমাণ লোক তাঁকে ফোন করেছেন। তিনি তাঁদের বলেছেন যে যা তিনি পেয়েছিলেন, তা ইতিমধ্যেই বিতরণ করে দিয়েছেন। তিনি তাঁদের এ-ও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী সবাইকে খাবার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যখন আমরা আরও সাহায্য পাব, আমি নিশ্চিত করব যেন আপনারা কিছু পান।'

যতই লকডাউনের দিন যাচ্ছিল, অর্থনৈতিক সংকট ততই আরও খারাপ হচ্ছিল। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সরকারি ত্রাণ পৌঁছায়নি, কিন্তু সরকার নতুন সাহায্য পরিকল্পনা ঘোষণা চালিয়ে যায়। আরও বেশি মানুষ স্থানীয় সরকারের কাছে সাহায্যের জন্য যেতে থাকে। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে, ইউনিয়ন পরিষদের যে চেয়ারম্যানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি জানান যে ৩০০ থেকে ৪০০ মানুষ প্রতিদিন তাঁর বাড়ির সামনে ত্রাণের খোঁজে আসত। তথ্য বা জনশ্রুতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রামীণ হাওর এলাকার একজন জেলে জানান,

> বর্তমানে কম্পিউটারের যুগ, ঢাকায় কোনো সিদ্ধান্ত হলে গ্রামেও মানুষ সেটি জানতে পারে। যখন মানুষ শোনে যে ত্রাণ বিতরণ করা হবে, তখন তারা চেয়ারম্যান-মেম্বারদের কাছে যায়।

মফস্বলের একজন চায়ের দোকানদার জানান,

> যখন মানুষ টেলিভিশনে দেখে যে সরকার এটা দিচ্ছে, সেটা দিচ্ছে, তখন তারা চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের বাড়ির সামনে গিয়ে ভিড় জমায়। জনপ্রতিনিধিরা মানুষজনকে সান্ত্বনা দিয়ে জানান যে তাঁরা কিছু না কিছু পাবেন। তাঁরা মানুষের নাম টুকে রাখে, তাঁদের ভোটার কার্ডের (জাতীয় পরিচয়পত্র) ফটোকপি জমা রাখেন।

সরকার অতিমারির সময় ত্রাণ বিতরণে আরও বেশি স্বচ্ছতার পদ্ধতি পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু জবাবদিহি ব্যবস্থা উন্নত করার ব্যাপারে সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে কেউ সচেতন ছিল বলে মনে হয়নি। মে মাসের শুরু থেকে সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচিত কর্মকর্তা, সিভিল সমাজ এবং দলীয় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে 'ওয়ার্ড কমিটি' গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয় জেলা প্রশাসনকে। এ ছাড়া দুটি হটলাইন নম্বর চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয় যেন ত্রাণ চেয়ে মানুষ ফোন করতে পারে অথবা সাহায্য বিতরণে কোনো প্রকার অনিয়মের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে। ত্রাণগ্রহীতাদের একটি কার্ড দেওয়ার কথা ছিল, যেখানে একটি কোড থাকবে। এ ছাড়া সরকারের একটি সফটওয়্যার করার কথা ছিল, যা দিয়ে প্রতিটি কার্ডধারীর কাছে সাহায্য বিতরণের পরিমাণ নজরদারি করা যাবে। আমাদের উত্তরদাতাদের কেউ এসব জবাবদিহি ব্যবস্থার বিষয়ে জানতেন না বলে জানিয়েছেন।

ওপরে ত্রাণগ্রহীতাদের তালিকা তৈরির জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ ও একক প্রক্রিয়ার দৃশ্যকল্প করা হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল। উপকূলীয় গ্রামীণ এলাকায় ত্রাণগ্রহীতারা বারবার স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানান বলে জানা গেছে। দুটো মফস্বল এলাকাতেই একাধিক ত্রাণগ্রহীতা জানান যে তাঁরা ত্রাণের জন্য কারও কাছে যাননি। তবু সরাসরি তাঁদের বাড়িতে ত্রাণ পৌঁছে গিয়েছিল। ত্রাণ পেয়েছেন এমন একজন কৃষিশ্রমিক জানান যে 'জামাল দাদার' মাধ্যমে তিনি ত্রাণ পেয়েছেন। সেই দাদা একজন সম্মানিত কমিউনিটি নেতা। তাঁর সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের সুসম্পর্ক রয়েছে। এ ছাড়া তিনি ওয়ার্ড কমিশনারের বন্ধু। ঢাকার বস্তির ত্রাণগ্রহীতারা জানান যে তাঁরা ত্রাণ পাওয়ার জন্য কমিউনিটি নেতাদের কাছে গেছেন। এসব নেতা ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত। তালিকা প্রস্তুত করার জন্য স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা বা ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা গ্রাম, আশপাশের এলাকা এবং অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে গিয়েছিলেন। শহুরে শিল্প এলাকায় একাধিক ত্রাণগ্রহীতা জানান যে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা সযত্নে বাড়িওয়ালাদের সহায়তা নিয়ে তালিকা প্রস্তুত করছিলেন। একটি মফস্বল এলাকায় একজন হস্তশিল্পকর্মী ত্রাণের জন্য কারও কাছে যাননি বলে জানান, কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার তাঁর স্ত্রীর নাম নিয়ে ত্রাণ দিয়েছিলেন।

শহুরে শিল্প এলাকার উত্তরদাতারা মনে করেন যে ত্রাণ বিতরণ সুষ্ঠু হয়েছে। কিন্তু এর বাইরে অন্য এলাকাগুলোয় ত্রাণগ্রহীতারা ত্রাণ বিতরণের বিষয়ে সমালোচনামুখর

ছিল। মফস্বল ও গ্রামীণ হাওর এলাকায় ধনীরা যাঁদের ত্রাণ দরকার ছিল না, তাঁরাও ত্রাণ পেয়েছেন। কারণ, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। গ্রামীণ হাওর এলাকায় একজন ত্রাণগ্রহীতা জানান, ত্রাণগ্রহীতাদের তালিকা কে প্রস্তুত করছে, তা বলা মুশকিল, 'একদিন ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার নাম নিতে আসে তো পরের দিন আসে আওয়ামী লীগের লোক।' কিছু এলাকায় ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতারা এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা আলাদা তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। পরবর্তীকালে দুটি মিলিয়ে ত্রাণগ্রহীতাদের একক তালিকা প্রস্তুত করা হয়। মফস্বল এলাকার একাধিক স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি বলেছেন, ত্রাণগ্রহীতাদের ২০ শতাংশ ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত।

ত্রাণ বিতরণে সমস্যা ছাড়াও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা এবং ত্রাণগ্রহীতারা গৃহীত ত্রাণের পরিমাণ এবং যে গতিতে এসব ত্রাণ এসে পৌঁছেছে, সে ব্যাপারে সমালোচনামুখর ছিল। মফস্বল এলাকার একজন স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি তাঁর বিরুদ্ধে ত্রাণ চুরির অভিযোগ ও অপমান খারিজ করে দেন। তিনি জানান, সবাইকে দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত ত্রাণ এখনো তাঁর কাছে আসেনি। ত্রাণ এসেছিল অপ্রত্যাশিতভাবে। তিনি ত্রাণের চালের মোট সাতটি বরাদ্দ পেয়েছিলেন লকডাউনের প্রথম মাস পর্যন্ত। এটি দিয়ে তিনি তালিকার ৮০০ জনের মধ্যে ৩২০ জনকে দিতে পেরেছিলেন। অন্য স্থানেও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা একইভাবে সরকারি ত্রাণের ঘাটতি এবং গতি নিয়ে অভিযোগ জানান। অন্যদিকে, ত্রাণগ্রহীতারা প্রতি প্যাকেটে যে পরিমাণ ত্রাণ ছিল, তা নিয়ে অভিযোগ জানান। তাঁরা বলেন যে এই পরিমাণ ত্রাণ দিয়ে তাঁদের পরিবারকে মাত্র কয়েক দিন খাওয়ানো যাবে। এর ফলে তাঁরা জীবিকার অন্য উৎস খুঁজতে বাধ্য হয়েছিলেন। একটি জবাবদিহি ও স্বচ্ছ পদ্ধতির মাধ্যমে পর্যাপ্ত ত্রাণ দিতে না পারার ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটেই লকডাউন তুলে নেওয়ার বিষয়টি বুঝতে হবে। যেহেতু লকডাউন সুষ্ঠু বা বাস্তবায়নযোগ্য কোনোটাই ছিল না, তাই লকডাউন বিধি মেনে চলার চর্চা দুর্বল হওয়ার ঘটনায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই দুর্বল হওয়ার বিষয়টি রাষ্ট্রের দায়িত্বসম্পর্কিত নৈতিক অর্থনীতি দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে দুর্যোগ ও জীবিকাসংকটের বেশ কিছু ঐতিহাসিক মুহূর্তে বিষয়টি পরীক্ষিত এবং আপস করা হয়েছে (Hossain 2017; 2018)। লকডাউন সফল হওয়ার বিষয়টি সব সময়ই মানুষের বেঁচে থাকার সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। যখনই এই বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তখনই লকডাউন সমাপ্তির ঘটনা দেখা যায়।

লকডাউনের সমাপ্তি

যদিও লকডাউন শেষ করার ব্যাপারে সরকার কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় দফার সাক্ষাৎকারদাতারা সবাই বলেছেন যে সরকারিভাবে লকডাউন

শেষ হয়ে গিয়েছিল। এপ্রিলের শেষ ভাগ থেকে অর্থনীতির বিভিন্ন খাত পুনরায় খুলে দেওয়ার জন্য বেশ কিছু ধারাবাহিক ঘোষণা আসে। এসব ঘোষণাকেই মানুষ লকডাউন উঠিয়ে নেওয়া হিসেবে ধরে নিয়েছিল। এপ্রিলের শেষের দিকে সরকার পোশাক কারখানা পুনরায় খোলার অনুমতি দেয়। বিষয়টি গবেষণা স্থানগুলোর জন্য তাৎপর্যপূর্ণ; কারণ, সাক্ষাৎকারদাতাদের মধ্যে বিপুলসংখ্যক পোশাক খাতের কর্মী উপস্থিতি ছিলেন। যেমন গ্রামীণ হাওর এলাকা, মফস্বল এলাকা, ঢাকার বস্তি এবং শহুরে শিল্প এলাকা। ধান কাটার জন্য সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের (মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য মে) কারণে গ্রামীণ হাওর এবং মফস্বল এলাকায় কাজ ও চলাচল পুনরায় শুরু হয়। মে মাসের ৯ তারিখে 'অপ্রয়োজনীয়' দোকানপাটসহ সব দোকানপাট খোলার ঘোষণাকে ধরে নেওয়া হয় লকডাউন সত্যিকার অর্থেই তুলে নেওয়ার চূড়ান্ত সংকেত।

উত্তরদাতারা লকডাউনের সমাপ্তিকে রাস্তা ও বাজার থেকে পুলিশের নীরব এবং অঘোষিত উঠিয়ে নেওয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটি ঘটেছে টুকরোভাবে দোকানপাট খোলার আগে। পুলিশের উঠে যাওয়ার মতো স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, কমিউনিটি নেতা এবং তরুণ স্বেচ্ছাসেবীরাও টহল দেওয়া থেকে সরে আসেন। ঘরে থাকা বিষয়ে ক্রমাগত মাইকিং করাও বন্ধ হয়। মফস্বল এলাকার একজন ত্রাণগ্রহীতা বলেন, 'পুলিশও কাহিল হয়ে গেছে।' পুলিশের এই সরে দাঁড়ানোর বিষয়টিকে মানুষের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হওয়া, পর্যাপ্ত ত্রাণ দেওয়া এবং কার্যকরভাবে সেগুলো বিতরণ করার ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে।

আমাদের অনেক উত্তরদাতা যেমনটি অনুমান করেছিলেন যে পর্যাপ্ত সাহায্য বিতরণে সরকারের ব্যর্থতার কারণেই বহুসংখ্যক মানুষ নিজ ঘর ছেড়ে জীবিকার খোঁজে বের হন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সরকারের ব্যর্থতার কারণেই এই 'সুবিধাবাদী অবাধ্যতা' সৃষ্টি হয়েছিল (Levi 1997)। জীবিকার খোঁজে তারা পুলিশের চোখ ফাঁকি দিতে বাধ্য হয়। প্রায় সব কটি গবেষণা স্থানে লকডাউন বিধির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল পুলিশ ও নাগরিকদের মধ্যে লুকোচুরি খেলা। আমাদের গবেষণা স্থানগুলোয় কীভাবে পুলিশ দেখার সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট বন্ধ হয়ে যেত এবং মানুষ লুকিয়ে পড়ত, তার বর্ণনা দিয়েছেন উত্তরদাতারা। কিন্তু পুলিশ চলে যাওয়ার পরেই আবার বাণিজ্যিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড তারা শুরু করত। ঢাকায় বস্তির ভেতরের ছোট দোকানপাট পর্দা দিয়ে ঢেকে চলতে থাকত। সে সময়ে কমিউনিটির নেতা এবং তরুণ স্বেচ্ছাসেবীরা আসছেন কি না, সে বিষয়ে নজর রাখা হতো। মফস্বল এলাকায় একজন চায়ের দোকানদার বর্ণনা দেন যে একবার পুলিশ আসার আগে তিনি দোকান বন্ধ করে শেষ করতে পারেননি। সে অবস্থায় তিনি দোকান অর্ধেক খোলা অবস্থাতেই পালিয়ে পাশের খেতে গিয়ে লুকান। এই লুকোচুরি খেলা বড় সড়কেও হয়েছে। কারণ, মানুষ চেষ্টা করত রিকশায় বা হেঁটে পুলিশের চেকপোস্ট পার হতে। তারা

কাজ বা দান-দক্ষিণার আশায় বের হতো। উপকূলীয় গ্রামীণ এলাকার একজন রিকশাচালক ভ্যান বা মোটরসাইকেল কীভাবে পুলিশ আটক করেছিল, তার বর্ণনা দেন। কয়েকজনকে প্রহারও করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির উত্তরদাতারা পুলিশের চোখ ফাঁকি দেওয়ার এসব চেষ্টাকে জীবিকার খোঁজে মরিয়া হয়ে যাওয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কয়েকজন মন্তব্য করেছেন যে পুলিশের এক-দুইটা লাঠির বাড়ি ক্ষুধার্তকে দমাতে পারবে না।

যেহেতু সরকারি ত্রাণ পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় এবং জীবিকাসংকটের মাত্রার আরও অবনতি ঘটে, তাই পুলিশও এসব লকডাউন ফাঁকি দেওয়া মানুষদের সঙ্গে সহিংস আচরণ করতে পারছিল না। প্রথম দফার সাক্ষাৎকারে ঢাকায় বস্তির উত্তরদাতাদের দুটো ঘটনা থেকে দেখা যায়, ক্ষুধার্ত মানুষের নৈতিক দাবির কারণে পুলিশের বলপ্রয়োগের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। স্থানীয় সরকারের একজন প্রতিনিধি নিচের ঘটনাটির কথা বলেছেন,

> একজন রিকশাচালক তাঁর আধা বেলার স্বল্প আয়ে কেনা কিছু খাবার নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ফেরার পথে তিনি পুলিশের সামনে পড়ে যান। পুলিশ তখন রিকশার আসনটি আটক করে, সঙ্গে নিচে রাখা খাবারও। ওয়ার্ড কাউন্সিলর তখন পুলিশকে অনুরোধ করেন যেন রিকশাচালকের খাবার ফেরত দেয়। কাউন্সিলর জানতে চান, তা না হলে সে খাবে কী? পুলিশ উত্তরে জানায় যে সরকার খাবার দেবে। কাউন্সিলর জানান, কিন্তু সরকারি ত্রাণ তো এখনো আসেনি। এ কদিন তো তাঁকে বাঁচতে হবে। এরপর পুলিশ রিকশার আসন এবং খাবার ফিরিয়ে দেয় রিকশাচালককে।

ইটভাটায় কাজ করা এক ব্যক্তি আরেকটি ঘটনার বর্ণনা দেন,

> ১ নম্বর লেনের ৭ নম্বর বস্তিতে আমার বাসা। গতকাল, দুজন লোক আমার বাড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। পুলিশ তাঁদের একজনকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে ঘরের ভেতর যেতে বলে। যাঁকে পুলিশ আঘাত করে, তিনি তখন পুলিশকে পাল্টা জবাবে বলেন, 'স্যার, আপনি যদি আমাকে খাবার দেন, তাহলে আমি আর রাস্তায় বের হব না।' এ কথা শোনার পর পুলিশ কিছু না বলে চলে যায়। আসলে, পুলিশ আমাদের ভালো চায়, তারা চায় আমরা যেন নিজ ঘরে নিরাপদে থাকি। আমার যদি খাওয়ার ও বাঁচার সামর্থ্য থাকত, তাহলে কি আমি রাস্তায় বের হতাম?

শর্ত সাপেক্ষে লকডাউন মেনে চলার ব্যাপারে এই বিবৃতির কারণে নীতিগতভাবে নিশ্চুপ থাকার ভিত্তি তৈরি হয়েছিল, সরকারি ত্রাণ না থাকায় গরিব ও ক্ষুধার্ত মানুষকে রাস্তা বের হতে না দিতে বলপ্রয়োগের ক্ষমতার বৈধতা নষ্ট হয়ে যায়। সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হতো, হয় পর্যাপ্ত ত্রাণ দেওয়া, না হয় মানুষকে কাজ করতে অনুমতি দেওয়া। নীরবে পুলিশ উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে অসম এবং সম্ভাব্য জীবনের হুমকির মতো পরিণতি থাকা সত্ত্বেও সরকার লকডাউন কড়াকড়ি করা থেকে বিরত থেকেছে বলে প্রতীয়মান হয়। লকডাউনের মাধ্যমে মানুষকে ভাইরাস থেকে সুরক্ষা দেওয়া এবং লকডাউন চলাকালে নাগরিকদের পর্যাপ্ত ত্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার বদলে সরকার

মূলত নাগরিকদের কাঁধেই সে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। সুষ্ঠু ও বাস্তবায়নযোগ্য নীতির অভাব থাকায়, জোরালো ও অংশীদারি নৈতিক অর্থনীতির আদর্শই দৃশ্যত লকডাউন বিধির শিথিলতা অনুমোদন করেছে। এতে রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদেরও সমর্থন ছিল।

৪. আলোচনা ও উপসংহার

বাংলাদেশ সরকার ২০২০ সালের ১৯ এপ্রিল করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়া রোধে লকডাউন জারি করে। এই লকডাউন বিধি জারি করার পদ্ধতি ছিল অন্য অনেক দেশের মতোই অনিশ্চিত এবং অসম প্রতিক্রিয়া। এ অবস্থা শুধু দুর্বল স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাসংবলিত দেশেই ছিল, তা নয়। যদিও জনঘনত্ব বিবেচনায় করোনাভাইরাসে বাংলাদেশের বিপন্নতা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতা ছিল, কিন্তু তবু লকডাউন মাত্র দুই বা তিন সপ্তাহ ছিল। এরপর ধীরে ধীরে এটি তুলে নেওয়া হয় অকেজো বলে। কারণ, জনসংখ্যার বেশির ভাগের অনিশ্চয়তা এবং দারিদ্র্য বিবেচনায় নিতে হয়েছিল। সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে দেখলে, প্রতিশ্রুত ত্রাণ কর্মসূচি যা দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল খুবই কম, এসেছিল খুবই দেরিতে এবং লকডাউন দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে যে ধরনের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া দরকার বলে অনেকে বিশ্বাস করেছিল, সেগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে জবাবদিহি ছিল না। ২০২০ সালের মে মাসেও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার হার বেড়েই চলেছে (এই নিবন্ধ লেখার সময়ে)।

সারা বিশ্বেই করোনাভাইরাস রাষ্ট্রের সক্ষমতার পরীক্ষা নিয়েছে, বিশেষ করে রাষ্ট্রের 'অবকাঠামোগত ক্ষমতার' বা প্রয়োজনীয় কিন্তু অজনপ্রিয় নীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে নাগরিকদের সংগঠিত করার সক্ষমতার পরীক্ষা। প্রতিটি দেশই এই চ্যালেঞ্জ নিয়েছিল পদক্ষেপ গ্রহণের একটি অদ্বিতীয় মিশ্রণের মাধ্যমে, যা বিভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং যা বিভিন্ন গোষ্ঠীকে আলাদাভাবে আক্রান্ত করেছিল। এ ক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারিত হয়েছে নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক, অতিমারির ব্যাপারে অতীতের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার সক্ষমতা, রাজনৈতিকীকরণ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন এবং বিপন্নদের বিবেচনায় নেওয়ার সক্ষমতা দ্বারা (Capano et al. 2020)। যেভাবে ভারত অতিমারি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে, তার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রচেষ্টার মিল রয়েছে, তাৎক্ষণিক, শাস্তি প্রদাননির্ভর এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, দুর্বল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে লকডাউন আরোপ এবং নীরবে তা তুলে নেওয়ার ক্ষেত্রে গণহারে ভারতের মতো জোর খাটানো লাগেনি বা স্বাস্থ্যসেবাকর্মী ও অন্যদের পাকিস্তানের মতো অবস্থা হয়নি। মূল কথা এই নয় যে বাংলাদেশের পদক্ষেপ গ্রহণ বেশি কার্যকর ছিল। তবে কথা হলো, বাংলাদেশের দুর্বল পদক্ষেপ গ্রহণের কারণ ছিল জনগণের কাছে রাষ্ট্রের বৈধতা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা, শুধু অক্ষমতা নয়। বাংলাদেশের মূল ব্যর্থতা হলো ন্যায্য হিসেবে বিবেচিত একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক

ত্রাণ কার্যক্রম তৈরি করতে না পারা। এই ব্যর্থতাই লকডাউন বিধি মেনে না চলা এবং নীতি প্রয়োগে বিরত থাকা জায়েজ করেছিল, যার ফলে নীতি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল সুবিধামতো।

বাংলাদেশের ঘটনা থেকে যেটি স্পষ্ট তা হলো জনস্বার্থে অজনপ্রিয় নীতি বলবৎ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্ষমতার গুরুত্ব। বিগত দশকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সক্ষমতা ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সঠিক নীতি কার্যদক্ষতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের বৈধতা প্রদর্শনের জন্য জোরালো একগুচ্ছ রাজনৈতিক প্রণোদনাও রয়েছে। তবু বাংলাদেশ রাষ্ট্র এখন পর্যন্ত লকডাউন নীতি এবং একটি ন্যায্য ও কার্যকর ত্রাণ কর্মসূচি বলবৎ করতে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরীক্ষা হিসেবে অতিমারি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া অন্যায্য এবং অবাস্তবায়নযোগ্য হিসেবে বিবেচিত নীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে নাগরিকদের শর্ত সাপেক্ষে মেনে চলা দেখা গেছে। এমন প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র চাইলে আরও বেশি বলপ্রয়োগের নীতিতে যেতে পারত। কিন্তু এর বদলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র লকডাউনের নীতি নীরবে ঝেড়ে ফেলে। তারও আগে নীতি বলবৎ করা থেকে বিরত থাকার পথ নিয়েছিল। নীতি মেনে না চলা এবং বিরত থাকা—দুটোই বুঝতে হবে জীবিকাসংকটে রাষ্ট্রের নৈতিক অর্থনীতি নির্মাণ ক্ষমতার আলোকে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দুর্যোগ, জীবিকার সংকট এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার মতো বিষয় আগেও ঘটেছে। এসব ঘটনায় জীবিকাসংকটের প্রেক্ষাপটে জনগণের সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভূমিকা বিষয়ে বেশ কিছু মূলনীতি রয়েছে। এসব মূলনীতি পরীক্ষিত হয়ে আপসরফা হয়েছে। করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে ব্যর্থ লকডাউন প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের সক্ষমতার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য সামনে নিয়ে এসেছে। এসব বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসজুড়ে বিবর্তিত হয়েছে। কারণ, রাষ্ট্র যখনই দুর্যোগ ও অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছে, তখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব বিষয়ে নাগরিক ও রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আপসরফা করতে বেগ পেতে হয়েছে (Hossain and Jahan 2014; Hossain 2017)। এসব অভিঘাতের সময়ে সুরক্ষা প্রদান করার কাজকে নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে সামাজিক চুক্তির প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে (Hassan 2013; Hossain 2018)। সাজা প্রদানের মাধ্যমে লকডাউন বাস্তবায়নের পরিবর্তে মে মাসের শেষে এসে নৈতিক যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র বাধ্য হয় নৈতিক অর্থনীতির দাবি মেনে নিতে। এর কারণ হতে পারে রাষ্ট্র লকডাউন বিধি বাস্তবায়ন করতে খুবই দুর্বল অবস্থানে ছিল, অথবা ত্রাণ কর্মসূচিকে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা যন্ত্রের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে বাধ্য হয়।

এই নিবন্ধে আমরা রাষ্ট্রের সক্ষমতার ধারণাকে বিযুক্ত করেছি যেন করোনাভাইরাস সংকটের সময় বাংলাদেশে রাষ্ট্রের সক্ষমতার ধারণার বাস্তব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রদর্শনের আরও ভালো বিশ্লেষণমূলক বোধগম্যতা পেতে পারি। রাষ্ট্রের সক্ষমতার

তিনটি মাত্রা হলো বলপ্রয়োগের সক্ষমতা, রাজনৈতিক সমাজের কাছ থেকে কার্যকর স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের বৈধতার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ। চতুর্থ আরেকটি মাত্রাও প্রাসঙ্গিক, যেমন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজস্ব আদায়ের সক্ষমতা। এর মাধ্যমে দুর্বল ত্রাণ কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের সক্ষমতা ও আচরণ বুঝতে সুবিধা হবে।

লকডাউনের শুরুর দিকে রাষ্ট্র বেশ উচ্চমাত্রার বলপ্রয়োগের সক্ষমতা দেখিয়েছিল। তখন রাষ্ট্র বহুলাংশেই এর অজনপ্রিয় আদেশ মানতে নাগরিকদের বাধ্য করেছিল। অজনপ্রিয় আদেশ কথাটা এখানে জুতসই নয়; কারণ, লকডাউন নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এই অজনপ্রিয় আদেশের ধারণা বিভিন্ন বিষয়ের জটিল আন্তসম্পর্ককে পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না। গবেষণায় দেখা গেছে, আইন মেনে চলা নির্ভর করে মানুষের অর্থনৈতিক সামর্থ্য এবং অজানা বিষয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত তীব্র ভীতি (প্রাণঘাতী ভাইরাস সম্পর্কে গণমাধ্যমের ভীতিকর চিত্রায়ণ)। কিন্তু মানুষের জমানো সঞ্চয় যখন কমে গেল এবং ত্রাণ পাওয়ার আশা যখন মিইয়ে গেল, তখন লকডাউন বিধি মেনে চলার প্রণোদনা উবে গেল। তাই যখন নৈতিক অর্থনৈতিক ঐকমত্য গড়ে উঠল যে গরিব ও শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক চাহিদা মেটাতে লকডাউন অমান্য করতে হবে, তখন রাষ্ট্র নিজের বিধি বলবৎ করা বন্ধ করে দিল এবং এরপর পুরোপুরিই লকডাউন উঠিয়ে নিল। সুবিধা অনুযায়ী লকডাউন বলবৎ করার এই নীতির কারণ এই নয় যে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের সক্ষমতার অভাব ছিল। এর কারণ হলো গরিব ও ক্ষুধার্ত মানুষ লকডাউন বিধি অমান্য করা সত্ত্বেও রাষ্ট্র ইচ্ছাকৃতভাবে তা মেনে নেয় বা আইন বলবৎ করা থেকে বিরত থাকে।

রাজনৈতিক সমাজের কাছ থেকে রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘাটতি দেখা গেছে। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে রাজনৈতিক সমাজের স্থানীয় প্রতিনিধিদের সামলানোর ক্ষেত্রে আমলাদের ভূমিকায়। ত্রাণ কার্যক্রমে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা বাড়াতে সরকারের প্রচেষ্টা একদমই ফলপ্রসূ হয়নি। দ্রুতই রাষ্ট্র নিজের আর্থরাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে আপস করে। দীর্ঘদিনের স্থানীয় রাজনৈতিক চালকযন্ত্রের বৈশিষ্ট্যই হলো মক্কেল-খদ্দের সম্পর্ক এবং দুর্নীতি। সেই চালকযন্ত্রের কারণেই রাজনৈতিক সমাজকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশের প্রভুত্ববাদী দলীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই চালকযন্ত্র হলো স্থানীয় রাজনৈতিক এলিট এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক জোট, যা ক্ষমতাসীন দলের অধীন। ত্রাণ বিতরণ তদারকির দায়িত্ব আমলাদের কাছ থেকে চলে যায় রাজনীতিকদের কাছে। রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কম কার্যকর বা সুষ্ঠু ছিল কি না, তা উপলব্ধ হয়েছে এভাবে; ত্রাণ বিতরণের শাসনব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছে অস্বচ্ছ এবং মক্কেল-খদ্দের যুক্তি। এটিই ব্যাপকভাবে মানুষ মনে করে। রাষ্ট্র ত্রাণ বিতরণে 'বিরত' থাকেনি, রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছে, স্থানীয় রাজনৈতিক স্বার্থ থেকে ত্রাণ কার্যক্রমকে সরিয়ে রাখতে রাষ্ট্রের সক্ষমতার ঘাটতি ছিল। এর ফলে

অন্যায্যতার একটি জোরালো বোধ তৈরি হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে সামাজিক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কার্যদক্ষতার কারণে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বৈধতা উচ্চমাত্রার। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রশ্নে বৈধতার ঘাটতি থাকায় আমজনতার জীবিকার সুরক্ষা প্রদানে রাষ্ট্রের জোরালো প্রণোদনা রয়েছে। অতিমারির শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা আশা করেছিলাম যে রাষ্ট্র কার্যদক্ষতার বৈধতা বিষয়ে খুব গুরুত্ব দেবে (Murphy 2020)। অতিমারির ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের ব্যর্থতাকে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব? আমরা বিশ্বাস করি, রাষ্ট্র তা ব্যবস্থাপনা করতে পারত যেহেতু তার সম্ভাব্য রাজনৈতিক সুবিধা রয়েছে, যেমন সংগঠিত পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে আমজনতার ক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। বিষয়টি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আমজনতা এতটাই অসংগঠিত যে কার্যকরভাবে সুষ্ঠু ত্রাণ কর্মসূচি দাবি করতে পারছিল না। তাই এই শ্রেণির চাহিদা ও প্রত্যাশা এবং তাদের দাবি মেনে নেওয়ার কৌশলগত প্রণোদনার মানে হলো, যারা লকডাউন বিধি অমান্য করেছে, তাদের ওপর বলপ্রয়োগ বা শাস্তি দেওয়া থেকে রাষ্ট্র নিজেকে বিরত রাখতে বাধ্য হয়েছে। আমজনতার জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণ দিতে ব্যর্থতার পেছনে প্রধান কারণ বলে মনে হয় রাজনৈতিক ইচ্ছার ঘাটতি (জনগণের পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতার অভাবে)। রাষ্ট্র তাই উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সম্পদ দিতে পারেনি এবং দলীয় রাজনৈতিক চালকযন্ত্রের দ্বারা সেসব সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে যাওয়াও ঠেকাতে পারেনি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বরাদ্দ করা তহবিলের বেশির ভাগই দেওয়া হয়েছে তৈরি পোশাকশিল্পে, যার মালিকেরা কেন্দ্রীয় দলীয় রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত (Khan 2013)। ত্রাণ বিতরণে হয়তো প্রকৃতপক্ষে ব্যাপক আকারের দুর্নীতি হয়নি। কিন্তু নাগরিকদের দুর্নীতির বিষয়ে ভীতি ছিল। বিশেষ কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রও সেটি প্রশমনে এমন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, যার মাধ্যমে ত্রাণ কর্মসূচি স্বচ্ছভাবে বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে রাষ্ট্রের সদিচ্ছা প্রকাশ পাবে। ত্রাণ মূলত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থার মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে আবদ্ধ ছিল। কে কী পাবে, কখন পাবে এবং কীভাবে পাবে, সে ব্যাপারে অনিশ্চয়তার কথা যদি বলতে হয়, তাহলে বলা যায় যে নাগরিকদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক সুরক্ষা দিতে রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশের ঘটনা থেকে অতিমারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্ষমতার গুরুত্ব চিত্রিত হয়েছে। তবে যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বৈধতা ও রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্কের ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মাত্রার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেছে। এই বৈধতা ও রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্কের ধরনের জন্য নাগরিক এবং রাষ্ট্রের মধ্যে অসাধারণ ও অভূতপূর্ব সহযোগিতা ও আস্থার সম্পর্ক প্রয়োজন। নাগরিকদের কাজ বা ত্রাণের

খোঁজে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য জন-নৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে রাষ্ট্র একটি সাধারণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির শক্তি দেখিয়েছে। এই সংস্কৃতিতে যৌক্তিক জনস্বাস্থ্য নীতির চেয়ে নাগরিকদের জীবিকার আশু অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে 'বিরত থাকার' নীতির নিশ্চিতভাবেই সীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু বলপ্রয়োগের চেয়ে এটি অনেক বেশি বাস্তবসম্মত নীতি বা রাজনৈতিক বিকল্প। কারণ, এটি এমন এক প্রেক্ষাপট, যেখানে নৈতিক অর্থনৈতিক ঐকমত্য ছিল দুটো বিষয়ের মধ্যে বাছাই করা—কাজ করা নয়তো ক্ষুধায় মারা যাওয়া, অথবা লকডাউন মানা নয়তো করোনাভাইরাসে মারা যাওয়া।

যদিও প্রথম লকডাউন ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্র অতীতের মতো এবারও কথার চেয়ে কাজের লক্ষণ বেশি দেখিয়েছে, অর্থাৎ দ্রুত শিক্ষা গ্রহণ করে নীতি উন্নয়নে মনোযোগ দিয়েছে। যদিও অতিমারির কারণে বাংলাদেশে জোরালো স্বাস্থ্যব্যবস্থা শেষমেশ তৈরি হতেও পারে আবার না-ও পারে। কিন্তু যেহেতু পর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রদানে রাষ্ট্রের স্পষ্ট ব্যর্থতা রয়েছে, তাই সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর নকশা ও বিতরণব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নতুন করে সাজানোর প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। অতিমারির চাপে পড়ে রাষ্ট্রের সক্ষমতা পুনর্গঠিত ও পরীক্ষিত হচ্ছে, যেমনটি অন্যান্য দুর্যোগ ও সংকটের সময়েও দেখা গেছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য, ভবিষ্যতের গবেষণায় ত্রাণ কর্মসূচিতে আরও নিবিড়ভাবে নজর দেওয়া উচিত। কারণ, জনবৈধতা পাওয়ার ক্ষেত্রে এটিই এখন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এককভাবে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংকটকালে সুষ্ঠু ও বাস্তবায়নযোগ্য ত্রাণব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আশা করতে পারি না যে নাগরিকেরা আইন মেনে চলবে। আর এমন ঘটলে, অতিমারি বা অন্যান্য সংকটের সময় জনগণের সুরক্ষার জন্য প্রণীত নীতি নীরবে মুখ থুবড়ে পড়বে।

টীকা

নৈতিক অর্থনীতি

নৈতিক অর্থনীতি এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যার ভিত্তি হলো কল্যাণ, সুবিচার এবং ন্যায্যতা। বাজারব্যবস্থা এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবে না বলে যে ধারণা রয়েছে, নৈতিক অর্থনীতি তার বিপরীত। নৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের জীবনধারণের ন্যূনতম অর্থনৈতিক সুযোগ যদি রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে না পারে, তাহলে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার নৈতিক অধিকার জনগণের রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

১. From the national Institute of Epidemiology, Disease Control and Research (IEDCR) https ://www.iedcr.gov.bd/ [accessed May 30 2020].

২. "PM unveils Tk 72,750cr package to address the impact of coronavirus", The Daily Star, 5 April, 2020. https ://www.thedailystar.net/coronavirus-deadly-new-threat/news/combating-coronavirus-pm-announces-tk-727cr-stimulus-package-1889764 (special thanks to Md Mahan Ul Hoque for preparing a timeline of newspaper articles on government relief measures, all articles cited here are from Hoque's timeline).

৩. "50 lakh poor families to get Tk 2,500 cash assistance each," The Business Standard, 10 May, 2020. https ://tbsnews.net/coronavirus-chronicle/covid-19-bangladesh/50-lakh-poor-families-get-tk2500-cash-assistance-each

তথ্যসূত্র

Abi-Habib, Maria, and Julfikar Ali Manik. 2018. "Bangladesh Elections : Choice of 'Lesser of Two Evils,' Voters Say." *The New York Times*, December 29, 2018, sec. World. https ://www.nytimes.com/2018/12/29/world/asia/bangladesh-elections.html.

Ahmed, Nasiruddin. 2020. "Mobilization of Local Resources by Rural Local Government Institutions in Bangladesh." Mimeo. Dhaka : BRAC Institute of Governance and Development and BRAC University.

Amnesty International. 2020. "Bangladesh Must Put Human Rights at the Center of Its Covid-19 Response Strategies." London : Amnesty International. https :// www.amnesty.org/en/documents/document/?indexNumber=asa13%2f2268%2f2020&language=en.

Blair, Harry W. 1985. "Participation, Public Policy, Political Economy and Development in Rural Bangladesh, 1958-85." *World Development* 13 (12) : 1231-47. https ://doi.org/10.1016/0305-750X(85)90123-8.

Capano, Giliberto, Michael Howlett, Darryl S. L. Jarvis, M. Ramesh, and Nihit Goyal. 2020. "Mobilizing Policy (In)Capacity to Fight COVID-19 : Understanding Variations in State Responses." *Policy and Society* 39 (3) : 285-308. https :// doi.org/10.1080/14494035.2020.1787628.

Evans, Peter. 1995. *Embedded Autonomy : States and Industrial Transformation.* Princeton N. J. : Princeton University Press.

Frey, C, Chinchih Chen, and Giorgio Presidente. 2020. "Democracy, Culture, and Contagion : Political Regimes and Countries' Responsiveness to Covid-19." *Covid Economics* 18 : 222-38.

Hale, Thomas, Anna Petherick, Toby Phillips, and Samuel Webster. 2020. "Variation in Government Responses to COVID-19." *Blavatnik School of Government Working Paper* 31.

Hassan, Mirza. 2013. "Political Settlement Dynamics in a Limited-Access Order: The Case of Bangladesh." ESID Working Paper. Effective States and Inclusive Development Research Centre. http://www.effective-states.org/wp-content/uploads/working_papers/final-pdfs/esid_wp_23_hassan.pdf.

Hassan, Mirza, and Sohela Nazneen. 2017. "Violence and the Breakdown of the Political Settlement: An Uncertain Future for Bangladesh?" *Conflict, Security & Development* 17 (3): 205-23. https://doi.org/10.1080/14678802.2017.1319695.

Hassan, Mirza, and Wilson Prichard. 2016. "The Political Economy of Domestic Tax Reform in Bangladesh: Political Settlements, Informal Institutions and the Negotiation of Reform." *The Journal of Development Studies* 52 (12): 1704-21. https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1153072.

Hassan, Mirza, and Selim Raihan. 2017. "Navigating the Deals World: The Politucs of Economic Growth in Bangladesh." In *Deals and Development: The Political Dynamics of Growth Episodes*, 96-128. Oxford: Oxford University Press.

Holland, Alisha C. 2016. "Forbearance." *The American Political Science Review; Washington* 110 (2): 232-46. http://dx.doi.org.proxyau.wrlc.org/10.1017/S0003055416000083.

Hossain, Naomi. 2017. *The Aid Lab: Understanding Bangladesh's Unexpected Success.* Oxford: Oxford University Press.

---. 2018. "The 1970 Bhola Cyclone, Nationalist Politics, and the Subsistence Crisis Contract in Bangladesh." *Disasters* 42 (1): 187-203. https://doi.org/10.1111/disa.12235.

Hossain, Naomi, and Ferdous Jahan. 2014. "The Food Riots That Never Were: The Moral and Political Economy of Food Security in Bangladesh." Food Riots and Food Rights: The Moral and Political Econmy of Accountability for Hunger Project Reports. Brighton: Institute of Development Studies.

ICG. 2015. "Mapping Bangladesh's Political Crisis." 264. International Crisis Group.

Jahan, Ferdous, and Naomi Hossain. 2017. "Food Riots in Bangladesh? Garments Worker Protests and Globalized Subsistence Crises." In *Food Riots, Food Rights and the Politics of Provisions.* London: Routledge.

Jahan, Ferdous, and Asif Mohammad Shahan. 2016. "Agenda Shaping and Accountability in Public Policies: An Analysis of the Food Policy of Bangladesh." In *Public Policy and Governance in Bangladesh.* Routledge.

Kabeer, N. 2001. "Ideas, Economics and 'the Sociology of Supply': Explanations

for Fertility Decline in Bangladesh." *The Journal of Development Studies* 38 (1): 29-70. https://doi.org/10.1080/00220380412331322181.

Khan, Mushtaq. 2013. "Bangladesh: Economic Growth in a Vulnerable Limited Access Order." In *In the Shadow of Violence: Politics, Economics and the Problems of Development*, edited by Douglass North, John Wallis, Steven Webb, and Barry Weingast, 24-69. Cambridge: Cambridge University Press. https://eprints.soas.ac.uk/11680/.

Kleinfeld, Rachel. 2020. "Do Authoritarian or Democratic Countries Handle Pandemics Better? - Carnegie Endowment for International Peace." *Carnegie Endowment for International Peace* (blog). 2020. https://carnegieendowment.org/2020/03/31/ do-authoritarian-or-democratic-countries-handle-pandemics-better-pub-81404.

Levi, Margaret. 1997. *Consent, Dissent, and Patriotism*. Cambridge University Press.

Mahmud, Wahiduddin, M. Niaz Asadullah, and Antonio Savoia. 2013. "Bangladesh's Achievements in Social Development Indicators: Explaining the Puzzle." *Economic and Political Weekly* 48 (44): 26-28.

Mann, Michael. 1988. *States, War and Capitalism: Studies in Political Sociology*. Oxford: Basil Blackwell.

---. 2008. "Infrastructural Power Revisited." *Studies in Comparative International Development* 43 (3): 355. https://doi.org/10.1007/s12116-008-9027-7.

Meisburger, Tim. 2017. "Bangladesh's Democracy 2017: According to Its People A Survey of the Bangladeshi People." Dhaka: The Asia Foundation.

Migdal, Joel S. 1988. *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*. Princeton University Press.

Murphy, R Taggart. 2020. "EAST AND WEST Geocultures and the Coronavirus." *New Left Review*, no. 122: 58-64.

Rahman, Hossain Zillur, and Imran Matin. 2020. "Livelihoods, Coping, and Support during COVID-19 Crisis." Dhaka: BRAC Institute of Governance and Development and BRAC University and Power and Participation Resource Centre. https://bigd.bracu.ac.bd/publications/livelihoods-coping-and-support-during-covid-19-crisis/.

Riaz, Ali. 2019. *Voting in a Hybrid Regime: Explaining the 2018 Bangladeshi Election*. New York: Springer.

Slack, Paul. 1995. "Introduction." In *Epidemics and Ideas: Essays on the Historical Perception of Pestilence*, edited by Terence Ranger and Paul Slack, 1-20. Cambridge University Press.

Sultan, Maheen, Kabita Chowdhury, Sayada Jannatun Naim, Md. Shanawez Hossain, Mohammad Sirajul Islam, and Farah Huq. 2020. "Effect of COVID-19 on RMG Sector and Trade Union Efforts to Mitigate Fall Out." Rapid research response to COVID-19. Dhaka : BRAC Institute of Governance and Development and BRAC University. https ://bigd.bracu.ac.bd/study/effect-of-covid-19-on-rmg-sector-and-trade-union-efforts-to-mitigate-fall-out/.

TAF, and BIGD. 2019. "The State of Bangladesh's Political Governance, Development, and Society : According to Its Citizens." Mimeo. Dhaka : The Asia Foundation & BRAC Institute of Governance and Development.

Taylor, Sara L, Pauline Tweedie, and Shabbir Shawkut. 2018. "Bangladesh's Democracy : According to Its People; A Survey of the Bangladeshi People 2018." Dhaka : The Asia Foundation.

Thompson, E. P. 1991. "The Moral Economy Reviewed." *Customs in Common*, 259-351.

White, Sarah C. 1999. "NGOs, Civil Society, and the State in Bangladesh : The Politics of Representing the Poor." *Development and Change* 30 (2) : 307-26. https ://doi.org/10.1111/1467-7660.00119.

World Bank. 2020. "Bangladesh Must Ramp Up COVID-19 Action to Protect Its People, Revive Economy." Text/HTML. *World Bank* (blog). 2020. https ://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/12/bangladesh-must-act-now-to-lessen-covid-19-health-impacts.

Yunus, Mohammad, and Sultan Hafeez Rahman. 2015. *Municipal Finances in Bangladesh : Untapped Potential Or White Elephant?* BRAC Institute of Governance and Development, BRAC University.

সমাজতত্ত্ব

মহামারির অন্তরালে

বদরুল আলম খান

‘There is no return to normal because normal was the problem in the first place’
—হংকং শহরের একটি দেয়াললিখন

ভূমিকা

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা। অনেকটা অজান্তে এবং আকস্মিকভাবে পৃথিবী এক ভয়াবহ মহামারির মুখোমুখি হলো। চীনের উহান শহরে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে অজানা এক ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে একজন অসুস্থ হয়ে পড়ে। ব্যাপারটি তাৎক্ষণিক তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় না। এরপর ৩১ ডিসেম্বরের ঘটনা। একই উপসর্গ নিয়ে ওই শহরে আরও কয়েকজন আক্রান্ত হলো। এবার চীন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে (ডব্লিউএইচও) নিউমোনিয়াজাতীয় এক রোগের কথা জানাতে বাধ্য হলো। কিন্তু রোগের উৎস নিয়ে বিভ্রান্তি, নতুন রোগের উপসর্গ নিউমোনিয়ার সঙ্গে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এক মাসের মধ্যে আরও উদ্বেগকর খবর এল। ২০ জানুয়ারি বিজ্ঞানীরা জানলেন, এ ভাইরাস সংক্রামিত হচ্ছে এবং প্রচণ্ডভাবে ছোঁয়াচে। ২৪ জানুয়ারি *ল্যানসেট* নামের ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লেখক সতর্ক করে দিয়ে বললেন, এই ভাইরাস মহামারির উৎস হতে পারে।

চীনের প্রেসিডেন্ট ৭ জানুয়ারি মহামারির খবর পেলেন। ২৩ জানুয়ারি উহান শহরে লকডাউন ঘোষণা করা হলো। এরপর কোভিড মহামারি আকারে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েক দশক ধরে পৃথিবী বেশ কয়েকটি মহামারির মুখোমুখি হয়েছে। ২০০৩ সালে SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), ২০১২ সালে মার্স (Middle East Respiratory Syndrome), ২০১৩ সালে ইবোলা মহামারি আকারে আমাদের আঘাত করেছে। কিন্তু আমরা এসব মহামারিকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখিনি বা মহামারির উৎপত্তির পেছনে মূল কারণ কী, সেটি অনুসন্ধান করার তাগিদ অনুভব

করিনি। আমরা ভেবেছি, ভবিষ্যতে আর কোনো মহামারির মুখোমুখি হতে হবে না, যদিও মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসসহ বহু বিশেষজ্ঞ ভবিষ্যৎ মহামারি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ফ্লু প্রতিরোধের জন্য প্রতিবছর নতুন টিকা প্রস্তুত করতে হয়। ওষুধ কোম্পানিগুলো অত্যন্ত সম্পদশালী হলেও তারা বাজার এবং মুনাফার মাত্রার ওপর নির্ভর করে গবেষণা করে। ওষুধ তৈরি মুনাফার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। তারাও মহামারির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা ভাবেনি। ভ্যাকসিন তৈরিতে ঝুঁকি এবং মুনাফার কথা ভেবে তারা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে ২০১৯ সালের কোভিড মহামারির ব্যাপারে আমরা সতর্ক ছিলাম না। যদিও বিশেষজ্ঞরা জানতেন, নতুন মহামারি যেকোনো সময় আঘাত হানতে পারে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বা ব্যক্তি খাতে তেমন কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে এ মহামারি আমাদের আঘাত করেছে বৃহৎ আকারে, অনেক বেশি মারাত্মকভাবে এবং বিধ্বংসী রূপ নিয়ে। সভ্যতার কালো অধ্যায় হিসেবে এই মহামারি ইতিমধ্যে পরিচিতি পেয়েছে।

কোভিড-১৯ নিয়ে প্রতিটি দেশে যথেষ্ট লেখালেখি হচ্ছে। লেখাগুলো মূলত সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে। বিশেষজ্ঞরা মৃত্যুসংখ্যা, মহামারি নিয়ন্ত্রণে নানা পদক্ষেপ, নানা দেশের সাফল্য-ব্যর্থতা ওই সব লেখায় তুলে ধরছেন। নাগরিক স্বাস্থ্য নিয়ে, এই ভাইরাস থেকে কীভাবে নিরাপদ থাকা যায়, তার নানা পরামর্শসংবলিত নির্দেশনামা, টেলিভিশন, খবরের কাগজের পাতায় বিশাল আকারের বিজ্ঞপ্তি—সবই জনসাধারণকে সচেতন করার রাষ্ট্রীয় প্রয়াসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মহামারির ধ্বংসক্ষমতা যে বিপুল, সে কথা সবাই জানে। তার বিরুদ্ধে প্রতিটি দেশের সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে। তাকে প্রায় যুদ্ধ হিসেবে দেখার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। অতি সাম্প্রতিক কালে মানুষ আতঙ্কবাদ, সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এবার নতুন শত্রু হিসেবে এই ভয়ংকর মহামারি হাজির হলো। তবে মহামারির প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট নয়। মহামারির উৎসের গভীরে যাওয়া এবং তাকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে দেখার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে বেশ কিছু গবেষক ভিন্ন পথ ধরে এই মহামারিকে বোঝার উদ্যোগ নিয়েছেন। সেসব লেখার মধ্যে যেগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সেগুলো হচ্ছে প্রখ্যাত ভাষাবিদ এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক নোয়াম চমস্কির কিছু সাক্ষাৎকার এবং লেখা; *দ্য গার্ডিয়ান* পত্রিকায় প্রকাশিত বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ, মহামারি নিয়ে ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা বিবিসির ডকুমেন্টারি, অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত রাজনৈতিক জার্নাল *কনভারসেশন*-এ লেখা প্রবন্ধ। এগুলো মহামারি-সংক্রান্ত আলোচনায় যথেষ্ট অন্তর্ভেদী। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে মহামারির সত্যিকার কারণের ওপর আলোকপাত করতে এগুলো সাহায্য করে।

এই প্রবন্ধের মূল বিষয় কোভিড-১৯। কিন্তু এটি মহামারির সাময়িক গতি-প্রকৃতি নিয়ে নয়। মহামারির অন্তরালে বেশ কিছু প্রবণতা রয়েছে, যেগুলো

আর্থসামাজিক কিন্তু মহামারির জৈবিক দিকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার কারণে আমাদের দৃষ্টি থেকে সেগুলো কিছুটা ঢাকা পড়ে থাকে। তবে প্রবণতাগুলো নিয়ে ভাবা এবং সচেতন হওয়া জরুরি বলে মনে করি এই কারণে যে এর মধ্যে লুকিয়ে আছে আধুনিক-উত্তর সমাজের মূল এবং আদি সমস্যা। সে সমস্যাগুলো সচরাচর আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। কারণ, মহামারিকে আমরা আকস্মিক ঘটনা হিসেবে দেখে থাকি। কিন্তু কোভিড-১৯ নামের মহামারি আসলে কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। বর্তমান কালে অনুসৃত নিও লিবারেল (নয়া উদারনীতিবাদী) যে অর্থনৈতিক মডেল প্রতিটি দেশ অনুসরণ করছে, এটি তার অবশ্যম্ভাবী ফল। নিও লিবারেল অর্থনৈতিক মডেল অনুসরণ করে পৃথিবীব্যাপী বিশ্বায়ন নামের প্রক্রিয়াকে গতিশীল করা হয়েছিল, কিন্তু কোভিড-১৯ প্রমাণ করেছে, যে গতিতে বিশ্বায়ন এগিয়ে চলেছে এবং যে মাত্রায় তার প্রভাব মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে, সেটি মানবকল্যাণের চেয়ে বরং ক্ষতি সাধন করছে অনেক বেশি। নিও লিবারেল অর্থনৈতিক মডেল মহামারির মতো দুর্যোগ সামলাতে ব্যর্থ হয়েছে। এ মডেল বৃহত্তর সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এর কারণে সমাজে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে, ভূমণ্ডলের প্রাকৃতিক পরিবেশ অকল্পনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ফলে এ থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে এবং এর বিকল্পের কথা ভাবতে হবে।

দ্বিতীয়ত, কোভিড-১৯-কে কেবল চিকিৎসাশাস্ত্র বা স্বাস্থ্যবিষয়ক বিষয় হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। এটি বিশেষ করে সরকারি মহল বা বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রবণতা। কিন্তু কোভিড-১৯ ওই বিশেষ গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে বৈশ্বিক রাজনীতির মূল দ্বন্দ্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করেছে, যার মধ্যে পরাশক্তির ক্ষমতাকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব এবং তাদের আদর্শিক প্রতিযোগিতা অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়ত, কোভিড-১৯ মৃত্যুসংক্রান্ত ধারণায় পরিবর্তন এনেছে। নানা তথ্য থেকে জানা যায়, এই মহামারির মূল আঘাত ভোগ করেছে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বৃদ্ধ এবং বয়স্ক নারী-পুরুষ, সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী, কৃষ্ণাঙ্গ পরিচয়ের মানুষ। অর্থাৎ সমাজের কাঠামো পরিচয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে কোভিডের প্রভাব অনুভূত হয়েছে।

সবশেষে, ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক এবং মুদ্রাসংকটের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে ধস নামে। সে সময় অনেকে আশা করেছিল, আমাদের রাজনৈতিক ও করপোরেট মোগলদের বোধোদয় হবে, তারা সংকীর্ণ গোষ্ঠীভাবনা, করপোরেট জগতের লাভ-লোকসানের প্রতি অতিমাত্রিক অনুভূতিশীল না হয়ে সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের কথা ভাববেন। কিন্তু সেটি ঘটেনি। মহামারি আমাদের চিন্তাপদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আনেনি। কীভাবে নতুন গোষ্ঠীভাবনা সমাজকে নতুন পথে এগিয়ে নেবে, সে আলোচনা ঠিক ওই কারণে আজ অনেক বেশি গুরুত্বের।

এই মহামারি কি আকস্মিক ছিল

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল আমাদের অনেকের কাছে সুপরিচিত। তাঁর একটি উদ্ধৃতি এ আলোচনায় প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। উদ্ধৃতিটি হচ্ছে, 'The owl of Minerva spreads its wings only when the shades of nights are gathering'। হেগেল বাক্যটি 'Phenomenology of Spirit' নামে তাঁর একটি লেখায় ব্যবহার করেছিলেন। এটি ওই লেখার ভূমিকার শেষ লাইন ছিল। রোমান উপাখ্যান থেকে নেওয়া দেবী মিনারভাকে হেগেল প্রতীক হিসেবে সেখানে ব্যবহার করেছেন। মিনারভা বুদ্ধি এবং দর্শনশাস্ত্রের দেবী। দিনের শেষে তিনি প্যাঁচার আকার ধারণ করে মর্ত্যলোকে আত্মপ্রকাশ করেন। এই প্রতীক ব্যবহার করে হেগেল যেটি বোঝাতে চেয়েছেন, তার সঙ্গে কোভিড-১৯-এর সম্পর্ক রয়েছে। বস্তুত দেবী মিনারভার সন্ধ্যাকালীন আগমনকে আমরা বেশ কয়েকটি অর্থে বিশ্লেষণ করতে পারি। প্রথমত হেগেল দর্শনশাস্ত্রকে অন্য সব জ্ঞানের তুলনায় বিশুদ্ধ এবং সঠিক জ্ঞান হিসেবে দেখেছিলেন। এই জ্ঞান তাঁর ধারণায় সব জ্ঞানের ঘনায়িত রূপ। আমাদের সত্যিকার জ্ঞান আমরা লাভ করি যখন অন্য সব জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে যায় এবং দার্শনিক জ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়। দার্শনিক জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটে একেবারে শেষ পর্যায়ে। কারণ, এই জ্ঞান সব জ্ঞানের নির্যাস। দেবী মিনারভা ঠিক যেভাবে দিন শেষে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তেমনি দর্শনজ্ঞান কেবল জ্ঞানপ্রক্রিয়ার শেষ ধাপে লাভ করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ প্রকৃতি এবং সমাজ সম্পর্কে আমাদের সত্যিকার জ্ঞান আমরা দিনের শেষে আশা করতে পারি। রূপক অর্থে ব্যবহৃত হলেও কোভিড-১৯ নামের মহামারিকে আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। সংকীর্ণ জ্ঞানকাঠামোর সহায়তায় তাকে আমরা দেখেছি বা বিশ্লেষণ করেছি। তার উৎপত্তি ও তার প্রকৃতির সার্বিক চিত্র সে কারণে আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। সে কারণে আরও গভীরতা দিয়ে তাকে বোঝার উদ্যোগ নেওয়া জরুরি বলে মনে করি।

যেকোনো মহামারি আমাদের কাছে আকস্মিক বলে মনে হয়। ১৯১৮ সালের স্প্যানিশ ফ্লু আকস্মিকভাবে ইউরোপকে আঘাত করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের তাণ্ডবলীলার মধ্যে পাঁচ কোটি মানুষ ওই মহামারিতে জীবন হারায়। সাম্প্রতিক কালে সার্স, মার্স বা ইবোলা ভাইরাস আকস্মিকভাবে বহু মানুষের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে। সে কারণে যেকোনো মহামারিকে আমরা অঘটন হিসেবে ভাবি। এই ভাবনার পেছনে একটি মূল কারণ হলো মহামারিকে আমরা কেবল বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয় হিসেবে ধরে নিই। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সংস্কৃতি অনেক কাল ধরে আমরা লালন করছি। আমরা কখনো ভাবিনি, মহামারির আবির্ভাবের পেছনে সামাজিক বা অর্থনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রীয় নীতিগত ব্যর্থতা কারণ হতে পারে।

আপাতদৃষ্টে কোভিড মহামারি আকস্মিক ছিল সন্দেহ নেই, যার কারণে বিশ্ব অর্থনীতি হঠাৎ গতি হারিয়ে ফেলে। জীবনে স্থবিরতা নেমে আসে। আন্তর্দেশীয় যোগাযোগ বন্ধ হয়, অভ্যন্তরীণ চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আসে। বেকারত্বের সংখ্যা রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছায়। অর্থনৈতিক অগ্রগতির হারে লক্ষণীয় পতন লক্ষ করা যায়। লাখ লাখ মানুষ বেকার হয় এবং সব মিলিয়ে এক দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা জনজীবনকে অকেজো করে দেয়। সম্ভবত এসব দিক ভেবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) করোনা প্রভাবিত অর্থনীতিকে 'The Great Lockdown' হিসেবে বর্ণনা করেছে, ঠিক যেভাবে ১৯৩০-৩২ সালের বিশ্বমন্দাকে এবং ২০০৭ ও ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকটকে বর্ণনা করা হয়েছিল।

আকস্মিকতার অন্য দিক হলো, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো মহামারির তীব্রতা এবং বিধ্বংসকারী রূপ উপলব্ধিতে ব্যর্থতা দেখিয়েছে। কীভাবে মহামারির মতো এক দুর্যোগকে মোকাবিলা করা যাবে, তার কৌশল উদ্ভাবনে উন্নত বিশ্ব প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যর্থ হয়েছে। এত কাল ধরে যেসব আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে উন্নত বিশ্ব মাথা ঘামিয়েছে, সেগুলো তারা দীর্ঘ সময় ধরে পরিকল্পনার সুযোগ পেয়েছে এবং যথেষ্ট সময় ব্যয় করে সেগুলোর সমাধান খুঁজেছে। অন্য দেশকে নিয়ন্ত্রণে আনা উন্নত বিশ্বের অন্যতম উদ্দেশ্য। যেসব কৌশল ব্যবহার করে বাকি বিশ্বকে তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে, তার মধ্যে রাষ্ট্রনায়কদেরকে ঘুষ এবং নানা প্রলোভন দেওয়া, 'বেয়াড়া' দেশের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করা অথবা বোমারু বিমান পাঠিয়ে অন্য দেশকে শাসন করা। এসব ঐতিহ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশ ব্যবহার করে এবং এ ক্ষেত্রে তাদের মুনশিয়ানায় কোনো ঘাটতি দেখি না। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলা করতে গিয়ে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তার অর্থ হচ্ছে, নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ সংকট মোকাবিলায় এরা এত বেশি পারদর্শী নয়, বরং নানাভাবে ব্যর্থ হয়েছে, বিশেষ করে মহামারির মতো দুর্যোগ মোকাবিলা করতে গিয়ে, যে দুর্যোগ আপাতদৃষ্টে রাজনৈতিক নয়, এমনকি অর্থনৈতিক নয়, যদিও তার প্রতিফল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনকে পাশ কাটিয়ে যায়নি।

কোভিড-১৯-এর উৎপত্তিস্থল চীনের দক্ষিণ অঞ্চলের উহান নগরী। এই মহামারির ভাইরাস এখানকার একটি বাজারে প্রথমে ধরা পড়ে। ধারণা করা হয়, ভাইরাস এখানে জন্ম নেয় কাঁচা মাংসের বাজার থেকে। পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের দাবি, নানা ধরনের বন্য অথবা গৃহপালিত পশুর মাংস বিক্রি মহামারির অন্যতম উৎস। চীনের মানুষ বিভিন্ন বন্য প্রাণীর মধ্যে নানা ধরনের গুণ আছে বলে বিশ্বাস করে, যেগুলো নানা ক্ষেত্রে শরীরের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলেন, মহামারির কারণ বিশেষ কোনো দেশের জীবনসংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে না। এর মূল কারণ বিশ্বায়ন।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো চীনের অর্থনীতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানুষের চাহিদা একই অনুপাতে বেড়ে চলেছে। তবে চীনের ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি বা চাহিদা বৃদ্ধি একমাত্র প্রযোজ্য নয়। বস্তুত ভোগ্যপণ্যের প্রতি গভীর চাহিদা বিশ্বব্যাপী একটি প্রক্রিয়া এবং চাহিদা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী উপকরণ হিসেবে গণমাধ্যম, বিজ্ঞাপন, ফেসবুকসহ প্রযুক্তির অন্যান্য ক্ষেত্রকে ব্যবহার করা হচ্ছে। পণ্য বিক্রয় এবং তার প্রতি কৃত্রিম বা অকৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি না করে পুঁজিবাদী অর্থনীতি টিকতে পারে না। ক্রমাগত চাহিদা বৃদ্ধি ভোগবাদী অর্থনৈতিক সংস্কৃতির অংশ। চাহিদা পুঁজিবাদী অর্থনীতির জীবনীশক্তি। এই চাহিদা বিশ্বায়নের কারণে বৈশ্বিক রূপ ধারণ করেছে। বিদেশি পণ্য তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে নানা ধরনের পণ্য, ইংরেজিতে যাকে একজোটিক পণ্য (Exotic goods) বলে। ইউরোপ থেকে শুরু করে প্রতিটি মহাদেশে তাদের প্রতি বিপুল চাহিদা রয়েছে । ইউরোপে হাতির দাঁতের চাহিদা রয়েছে, গন্ডারের দেহের নানা অংশের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। সাপ, ব্যাঙ, কেঁচো, তেলাপোকা থেকে শুরু করে প্রাণিজগতের সবকিছু আজ ভোগ্যদ্রব্যের আওতায় আনা হয়েছে। ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা পূরণের জন্য পরিবেশকে ধ্বংস করা হচ্ছে। বনভূমি উচ্ছেদ করে সেখানে পণ্য উৎপাদনের কারখানা তৈরি হচ্ছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাম তেল চাষের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে বনভূমি কৃষির আওতায় আনা হচ্ছে। ফলে প্রকৃতির ওপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। বন্য প্রাণী তাদের আবাসস্থল হারিয়ে জনপদের কাছাকাছি আসতে বাধ্য হচ্ছে। সে কারণে ভাইরাসবাহিত বন্য প্রাণীর সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা আজ অনেক বেশি। ঠিক এই পরিস্থিতিতে মহামারিজাতীয় ভাইরাসের জন্ম ও তার বিস্তারকে অস্বাভাবিক বলে মনে করি না, বিশেষ করে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে।

বিশ্বায়নের আরও একটি দিক আছে। আজ মানুষের গতিশীলতা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার ক্ষেত্রে তেমন কোনো বাধা নেই, বরং শ্রমচাহিদার কারণে মানুষ এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে অহরহ পাড়ি দিচ্ছে। অভ্যন্তরীণভাবেও শ্রমশক্তি এক অঞ্চল থেকে দেশের অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত হচ্ছে। স্প্যানিশ ফ্লু ১৯১৮ সালে শুরু হয়েছিল। তার কারণও বিশ্বায়ন। সে সময় বিশ্বায়ন আজকের মতো ব্যাপক ছিল না। পৃথিবীর জনসংখ্যা সে সময় মাত্র ১ দশমিক ৭ বিলিয়ন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের কারণে এক দেশ থেকে অন্য দেশে মানুষের স্থানান্তর ঘটেছিল দ্রুতগতিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সেনাবাহিনীর বহু সদস্য যুদ্ধে অংশ নিতে ইউরোপে যায়। যুদ্ধের কারণে ভারত, আফ্রিকা ও এশিয়ার মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে বাধ্য হয়। চীনা শ্রমিক, ভারতীয় শ্রমিক যুদ্ধে সাহায্য করতে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় গেছে। ফলে মানুষের যাতায়াত বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্প্যানিশ ফ্লু ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে

ছড়িয়ে পড়েছে। আজ পৃথিবীর জনসংখ্যা ৭ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। মানুষের চলাচল বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। লাখ লাখ মানুষ কাজের সন্ধানে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করছে। ফলে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া এবং সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা আজ অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। কোভিড-১৯-কে সে কারণে আকস্মিক ভাবা যায় না। মহামারি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, যদি একে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি।

গণমানুষের সুস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগে ঘাটতি অন্য একটি কারণ। কয়েক যুগ ধরে বিশ্বের প্রতিটি দেশ স্বাস্থ্যব্যবস্থায় অনেক অবহেলা দেখিয়েছে, যদিও সামরিক বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি হারে। বাংলাদেশ তার উদাহরণ হতে পারে। এ দেশের স্বাস্থ্য খাতে ২০২০ সালে জাতীয় আয়ের ১%-এর কম অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই হিসাব বিশ্বব্যাংকের থেকে নেওয়া। এই একই চিত্র অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেসব খাতে বাজেট সংকোচন ঘটছে, সেগুলো হচ্ছে পাবলিক হেলথ, শিশুদের কিন্ডারগার্টেন এবং বয়স্ক জনসাধারণের সেবা। প্রতিটি উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য তেমন সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অর্থায়ন কমিয়ে দিয়েছেন। এমনকি মহামারির মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সদস্যপদ প্রত্যাহার করেছে এবং অর্থ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এ সবকিছুর উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য বিভাগের সিংহভাগকে প্রাইভেট খাতে হস্তান্তর করা। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে দুর্নীতি, অদক্ষতা, চরম প্রাতিষ্ঠানিক অব্যবস্থা এবং অপরিকল্পিত, দিন আনা দিন খাওয়া জাতীয় কৌশল। এটি বিশেষ করে দৃশ্যত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ সীমিত সম্পদের একটি অংশ দুর্নীতি এবং অব্যবস্থার কারণে রোগী সেবার কাজে ব্যয় না হয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির হাতে স্থানান্তরিত হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে যে প্রকট অব্যবস্থা দীর্ঘদিন বিরাজমান ছিল, কোভিড-১৯ সেটি উন্মোচন করেছে এবং এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা যে কত প্রকট, সেটি মূর্ত করে তুলেছে।

অধিকাংশ দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ইতিমধ্যে ব্যক্তি খাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। সুস্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্যসেবাকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ রেখে মুনাফা তৈরির মাধ্যম হিসেবে দেখা হচ্ছে। ব্যক্তিপর্যায়ে স্বাস্থ্যবিমা ছাড়া উন্নত এবং অনুন্নত দেশে চিকিৎসা পাওয়া কঠিন। যারা বিমা করার আর্থিক ক্ষমতা রাখে না, তারা অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ সুস্থ থাকার অধিকার হারিয়ে ফেলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ মিলিয়ন মানুষের স্বাস্থ্যবিমা নেই। ফলে তাদের পক্ষে সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। সরকারি স্বাস্থ্যসেবার দুরবস্থার কারণে মানুষের পক্ষে নানাবিধ রোগের চিকিৎসার সুযোগ সীমিত হয়ে এসেছে। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ,

লিভার, কিডনিসংক্রান্ত অসুস্থতার সুচিকিৎসা সুযোগের অভাবে সাধারণ মানুষ কোভিড মহামারির মতো দুর্যোগে অতি সহজে আক্রান্ত হচ্ছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রও সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে মহামারি মোকাবিলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে।

বিশ্বায়নের কারণে সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। হিসাবে দেখা গেছে, বিশ্বের ৫% মানুষের হাতে ৭৫% সম্পদ রয়েছে। ফলে বিশ্বায়ন সবার ভাগ্যে পরিবর্তন এনেছে, এ দাবি সঠিক নয়। অত্যন্ত ধনী দেশ অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা আড়াই কোটি। অথচ সেখানে ৩০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। বিশ্বায়নের কারণে স্থায়ী চাকরি বলে কিছু নেই। অধিকাংশ কাজ অস্থায়ী, অনিয়মিত। সে কারণে মানুষকে একাধিক স্থানে কাজ করে সংসার চালাতে হয়। তা ছাড়া এসব কাজে বেতন খুবই সামান্য, যা জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪৪% শ্রমিক বছরে ১৮ হাজার ডলারের বেশি আয় করে না। এ দিয়ে সংসার চালানো কঠিন। অধিকাংশ শ্রমিকের জন্য অসুস্থতাজনিত কারণে বেতনসহ ছুটির কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে অসুস্থ হলেও শ্রমিককে বাধ্য হয়ে কাজে যেতে হয় এবং এতে করে শরীরের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে, যেটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ঠিক এই কারণে করোনায় আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কাজে গেছে এবং মহামারি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। অন্যদিকে ধনীদের ক্ষেত্রে জীবন থেমে থাকেনি। তারা তাদের বিলাসবহুল ইয়টে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে অথবা নির্জন দ্বীপে বসতি স্থাপন করে নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গ, এশীয়, লাতিন বংশোদ্ভূত মানুষ সে তুলনায় কোভিড-১৯-এর তাণ্ডবের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছে। মৃত্যুকে মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের ভাগ্যে বিকল্প কিছু জোটেনি। এই আর্থসামাজিক কারণগুলো মহামারিসংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করা প্রয়োজন। এগুলোর সমাধান ব্যতীত ভবিষ্যৎ মহামারি আরও প্রগাঢ় হয়ে আবির্ভূত হতে পারে বলে ধারণা করি।

নিও লিবারেল অর্থনীতি

দেবী মিনারভার কাছে আবার ফিরে যাই। আগেই বলেছি, তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ক্ষমতাবান দেবী। তার হাতে অপরিসীম ক্ষমতা। দেব-দেবীরাই আদিকালের চালিকা শক্তি ছিল। তারা সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে মর্ত্যলোকের ওপর শাসন করত। নশ্বর মানুষের সীমিত ক্ষমতা দেব-দেবীর ক্ষমতার কাছে তুচ্ছ। দেবী মিনারভাকে নিয়ে ক্ষুদ্র একটি গল্প আছে। গল্পটি রোমান লেখক এবং কবি অভিড তাঁর লেখা 'মেটামরফোসিস' নামের কবিতাগুচ্ছে উল্লেখ করেছেন। অতি সাধারণ এক কৃষক কন্যা, নাম আরাচনে, মিনারভাকে একদিন চ্যালেঞ্জ করে বসে। সে দাবি করল, 'আমি তোমার চেয়ে সুন্দর কারুকার্যময় বুনন তৈরি করতে পারি।' এ কথা শুনে মিনারভা অখুশি। মিনারভা তাকে প্রতিযোগিতায় ডাকলেন। কৃষককন্যা

প্রতিযোগিতার জন্য গ্রামীণ জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে অতি চমৎকার একটি কার্পেট তৈরি করল। অন্যদিকে দেব-দেবীদের খুশি করার উদ্দেশ্যে মিনারভা নানা দেব-দেবীর চেহারাসংবলিত একটি কার্পেট তৈরি করল। প্রতিযোগিতার দিন ঘনিয়ে এল। বিচারকমণ্ডলীর সবাই দেব-দেবী। তারা নির্দ্বিধায় মিনারভাকে বিজয়ী ঘোষণা করল। এ উপমা বর্তমান বিশ্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আজ পৃথিবী দেব-দেবীমুক্ত নয়। তাদের প্রমত্ত শক্তির কাছে সাধারণ মানুষ অসহায়।

শুরুতে কোভিড-১৯ মহামারি বিশ্ব অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। প্রথম ধাক্কায় কলকারখানা, যোগাযোগব্যবস্থা, উৎপাদন এবং আমদানি-রপ্তানি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়ে। ফলে মানুষের চাহিদা সীমিত হয়ে আসে। সুপারমার্কেটসহ সব ধরনের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অচল হয়ে পড়ে। দুর্যোগ সামনে রেখে প্রায় প্রতিটি দেশের সরকার নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হয়। প্রাইভেট সেক্টর এবং গণমাধ্যম সরকারের কাছে প্রণোদনার জন্য ভিক্ষা প্রার্থনা করে। যারা মুক্তবাজার এবং বাজার অর্থনীতির পক্ষে, তারা রাষ্ট্রীয় খাতে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য দেনদরবার শুরু করে। এদের সবার উদ্দেশ্য, ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে মহামারির বিরূপ প্রভাব থেকে বাঁচানো। বড় বড় কোম্পানির কর্মচারীরা দীর্ঘদিন যেন বেকার না থাকে, সে জন্য সরকার বেকার ভাতা চালু করল। বিনোদন প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শুরু করে বিমান পরিবহন, কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক এবং কর্মচারীদের অর্থনৈতিক প্রণোদনার নানা প্রকল্প হাতে নেওয়া হলো। দেশের অবকাঠামো নির্মাণে সরকার বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করে অর্থনীতিকে চাঙা রাখল। অর্থনীতি চাঙা রাখার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রক্ষণশীল সরকার থেকে শুরু করে সব ধরনের সরকার প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেইন্স যে কল্যাণমূলক সমাজের কথা ভেবে নতুন অর্থনৈতিক মডেল হাজির করেছিলেন, সেই মডেল অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যক্তি খাতের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ২ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলার সহায়তার কথা জানাল। ওই একই নীতির আশ্রয় নিল অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ। জনগণের এই অর্থ প্রথমে ব্যক্তিমালিকানায় চালিত ব্যাংকগুলোকে সাহায্য হিসেবে দেওয়া হলো। তারপর রেলওয়ে, বিমান, বিমানবন্দর, ভ্রমণ সংস্থা, বিনোদনশিল্প ইত্যাদি এই সাহায্যের আওতায় এল। ছাত্রছাত্রীর অনুপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেউলিয়া হওয়ার পথে, তাদেরও এই দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রচুর অর্থ সাহায্য দিতে সরকার বাধ্য হলো। এ থেকে একটি দিক পরিষ্কার হয়, সেটি হচ্ছে ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট সেক্টর যখন বিপদে পড়ে, তখন তারা সরকারের কাছে অর্থাৎ জনগণের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে। কিন্তু সুসময়ে জনগণকে শোষণ করার ক্ষেত্রে এবং জনবিরোধী অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে বিন্দুমাত্র দ্বিধা দেখায় না। জনগণকে তারা ক্রেতা হিসেবে দেখে। জনগণের প্রতি তাদের কোনো সহানুভূতি নেই।

বিশ্বায়নের যারা প্রাতিষ্ঠানিক কর্ণধার (বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, জাতিসংঘ এবং বৃহৎ আকারের করপোরেট জগৎ, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে গুগল, আমাজন, মাইক্রোসফট এবং ফেসবুকের মতো বিশাল আকারের প্রতিষ্ঠান) তারা মুক্তবাজারের প্রবক্তা। তারা বাজারকে সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে স্বাধীন রেখে অর্থনৈতিক জীবনকে গড়ে তোলার পক্ষে। তাদের মূল কথা, পাবলিক সেক্টরকে দুর্বল করে প্রাইভেট সেক্টরের হাতে অর্থনীতির সবকিছু ছেড়ে দেওয়া। আশির দশকে শুরু হওয়া নব্য উদারনৈতিক এই অর্থনৈতিক মডেলের মূল বক্তব্য ছিল, বাজার ত্রুটিপূর্ণ হয় বাজারকে বাইরে থেকে যখন কোনো ঘটনা আঘাত করে (যেমন কোভিড-১৯)। অন্য অবস্থায় বাজার ত্রুটিহীন এবং অর্থনীতির চাকাকে চালু রাখতে তার মতো পারদর্শী আর কেউ নেই। তাদের দাবি, অর্থনীতিতে ব্যক্তি খাত প্রজ্ঞাভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেয়। ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অর্থনৈতিক মডেল ব্যবহার করে, যে মডেল গাণিতিক সূত্র দ্বারা পরিচালিত। বাহ্যিক কারণে অর্থনীতি বিপদে পড়লে মানুষের আয়, ব্যয় এবং উৎপাদনব্যবস্থায় অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন এলেও এ সংকট বাজার অর্থনীতির নয়। এ সংকট বহিরাগত। তারা আরও দাবি করে, সরকার প্রণীত অস্থায়ী কিছু হস্তক্ষেপ দিয়ে এই সংকটের সমাধান সম্ভব। সরকার যদি কিছু বিনিয়োগ করে এবং সুদের হার এদিক-ওদিক করে, তাহলে অর্থনীতি পুনরায় চাঙা হয়ে উঠবে এবং বাজার ত্রুটিমুক্ত হবে। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখবে। বাদবাকি দিকগুলো যেমন সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সমাজজীবনে স্বাবলম্বিতা এবং স্থায়িত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবে না। এই অর্থনীতির আরও দাবি হচ্ছে, সরকারি ব্যয়, সে স্বাস্থ্য খাত বা শিক্ষা বা দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প যেমন নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত (Renewable energy) অর্থনীতিকে উপকারের চেয়ে অপকার করে। ওই মডেলে সরকার হচ্ছে সমস্যা, সমাধান নয়। সরকার কেবল অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করবে। ঠিক যেভাবে বিশ্ব অর্থনীতি কোভিড-১৯-এর কারণে সংকটে পড়েছে। প্রতিটি দেশের সরকার এই নিও লিবারেল অর্থনীতির কাছে জিম্মি। সে কারণে বিশ্বব্যাপী প্রতিটি রাষ্ট্র বিলিয়ন বা ট্রিলিয়ন ডলারের মতো বিশাল মাপের অর্থনৈতিক প্রণোদনা পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে। সরকারের ব্যয় এর আওতায় বৃদ্ধি পেয়েছে, সুদের হার রেকর্ড পর্যায়ে নিম্নগামী, বিশাল স্কেলে সম্পদ ক্রয় হচ্ছে, যাকে Quantitative Easing বলা হয়। ব্যক্তি খাতকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে জনগণের এই অর্থ ব্যবহার হলেও জনগণের দুর্ভোগ মেটাতে ব্যক্তি খাত কখনো এক পয়সা ব্যয় করবে না। তারা মুনাফা বৃদ্ধির বাইরে অন্য কোনো দিক নিয়ে ভাবে না। অর্থনীতিতে সুদিন ফিরে এলে তারা পুনরায় স্বমূর্তি ধারণ করবে এবং তাদের শোষণপ্রক্রিয়া চালু রাখবে।

অর্থনৈতিক সংকটকে অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক ভাবা ভুল। অর্থনৈতিক সংকট

বাহ্যিক কারণে ঘটে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সংকট একটি স্থায়ী ব্যাপার। যে নীতি বিশ্বের উন্নত দেশগুলো সত্তরের দশক থেকে প্রয়োগ করে এসেছে এবং আজও সেই নীতির আশ্রয়ে অধিকাংশ দেশ এবং বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানগুলো চলছে, সেই নীতিকে আমরা নয়া উদারনীতিবাদ হিসেবে জানি এবং সেই নীতিই বর্তমান কালের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন পার্লামেন্ট এবং ইউরোপীয় কমিশন নিও লিবারেল অর্থনৈতিক মডেলে চলে এবং সব দেশকে ওই মডেল অনুসরণের কথা বলে এবং বাধ্য করে। এই নীতির মূল উদ্দেশ্য অর্থনীতির প্রাইভেট সেক্টরকে বলবান করা। তবে আগেই বলেছি, কোভিড-১৯ কেবল ওই বিশেষ অর্থনৈতিক মডেলের সংকটকে প্রকট করে তুলেছে। কারণ, চার যুগ ধরে চলে আসা নিও লিবারেল অর্থনৈতিক মডেল রাষ্ট্রের সামর্থ্যকে খর্ব করেছে। দ্রুত, স্বল্পমেয়াদি মুনাফা ভোগের আশায় বিশ্বায়নের নামে অ-শিল্পায়ন, ভঙ্গুর মুদ্রাব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সীমিত প্রভাবের কারণে শ্রমিকদের রক্ষাকবচ নেই। ওষুধ কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়ীকরণ ঘটেছে। তারা ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। ব্যক্তি খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে। প্রাইভেট সেক্টর ঋণের বোঝা নিয়ে আছে, আয় এবং সম্পদের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য, শ্রমবাজারে অনিশ্চয়তা এবং শ্রমের অস্থায়ীকরণ, হাতে গোনা কিছুসংখ্যক অলিগারকিক দ্বারা বাজার নিয়ন্ত্রণ—এসবই অর্থনৈতিক সংকটের মূল উৎস। কোভিড-১৯ এ ক্ষেত্রে অনুঘটক মাত্র, তার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়। বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংস্কৃতি এ ক্ষেত্রে দোষী হলেও অর্থনৈতিক সংকটকে তারা কোভিড-১৯-এর মতো বহিঃশক্তির প্রতিফল হিসেবে বর্ণনা করছে। অথচ সামাজিক অসাম্য, অনিশ্চিত কর্মসংস্থান, মুষ্টিমেয় কোম্পানির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সংকটের প্রধান উৎস।

তবে যে প্রশ্ন কোনোভাবে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সেটি হচ্ছে, মহামারিকালীন সরকার যদি প্রয়োজনীয় খাতে বিশেষ করে স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ এবং অবকাঠামো নির্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হয়, তাহলে মহামারি না থাকা অবস্থায় কেন এই অর্থ ব্যয়ে তারা ইতস্তত করে। অর্থনীতিকে সংকটমুক্ত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র যেসব অর্থনৈতিক প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সেটি প্রমাণ করে সরকার যদি এই পদক্ষেপগুলো তার দীর্ঘকালীন নীতির অংশ হিসেবে গ্রহণ করত, তাহলে মানুষের মধ্যে বৈষম্য, বর্ণ অসাম্য, সম্পদ বিতরণের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য কিছু মাত্রায় সহনীয় করা সম্ভব হতো। বাজার অর্থনীতি কোভিড-১৯-এর মতো মহামারিকে মোকাবিলা করতে পারেনি। কোভিড-১৯ প্রমাণ করেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাধান ব্যর্থ, প্রয়োজন যৌথ সম্মিলিত প্রচেষ্টার। স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন, কাজের নিশ্চয়তা প্রয়োজন, আয়ের স্থায়ী উৎস নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং পরাশক্তির মল্লযুদ্ধ

কোভিড-১৯ আন্তর্জাতিক পরিসরে বেশ কয়েকটি দ্বন্দ্ব তুলে ধরতে সাহায্য করেছে। প্রথমত মহামারি মোকাবিলায় গণতান্ত্রিক দেশের চেয়ে একনায়কতান্ত্রিক চরিত্রের দেশগুলো অনেক বেশি দক্ষতা দেখিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবে এই প্রবণতার মধ্যে ব্যতিক্রম রয়েছে যেমন গণতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়া বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো মহামারি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছে। এই সাফল্যের সবকিছু নির্ভর করেছে রাষ্ট্রের ওপর মানুষের আস্থা কতটুকু তার ওপর। দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম বা এমনকি চীনের হালকা ধরনের একনায়কতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রের ওপর নাগরিক সমাজের আস্থা অনেক বেশি। সে কারণে মহামারিকালে সরকার এসব দেশের মানুষকে যেভাবে চলতে বলেছে, মানুষ সেভাবে চলেছে, নিয়ম মেনেছে।

অতি উন্নত অর্থনীতি এবং গণতান্ত্রিক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, ভারত ও ব্রাজিলের মতো দেশে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এসব দেশ কোভিডকে গুরুত্ব দেয়নি অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ইতালিসহ ইউরোপীয় বেশ কিছু দেশ মহামারির মুখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। মহামারি মোকাবিলায় তারা কোনো কৌশল নিয়ে এগিয়ে আসেনি। অথবা তারা তার ভয়াবহতাকে অবমূল্যায়ন করে ব্যক্তিস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তারা এমনকি লকডাউন বা মাস্ক পরার বিরোধিতা করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচার স্থগিত রাখেননি। বড় বড় জমায়েত করেছেন এবং জমায়েত থেকে কোভিড ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে কোরিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর ও জাপানের মতো কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র কোভিড-১৯ দুর্যোগকে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। এর মূলে যে কারণ কাজ করে সেটি হচ্ছে, গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকার স্বল্প মেয়াদি প্রোগ্রামে উৎসাহী। তারা র‌্যাডিক্যাল সামাজিক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে না। কারণ, তাতে করে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে এবং তাদের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ার আশঙ্কা থাকে।

ইদানীং বিশ্বরাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী এবং বিশ্বায়নবিরোধী ধারা চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, ভারতের নরেন্দ্র মোদি, রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারো জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আশ্রয় নিয়ে ভিন দেশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছে। চীনের উহান শহরে মহামারির সূত্রপাত হওয়ার কারণে এরা চীনকে অভিযুক্ত করতে উৎসাহী। চীনের বিরুদ্ধে অভিযোগনামা বিশেষ করে মার্কিন প্রশাসনের বিবৃতিতে লক্ষণীয়, ইউরোপের কিছু দেশ এবং অস্ট্রেলিয়া মার্কিন বক্তব্যের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে চীনকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করছে না। চীন বিশ্ব মহামারির জন্য দায়ী—এ ধরনের বক্তব্য

ইদানীং বিশ্বরাজনীতির প্রবণতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। চীন উঠতি মহাশক্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টপকিয়ে তার অর্থনীতি অচিরেই বিশ্বের প্রধান শক্তিতে পরিণত হবে। চীনকে শায়েস্তা করার লক্ষ্যে এবং তার অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জাতীয়তাবাদী রাজনীতি চালু করেন। চীনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তার মহাশক্তির সম্ভাবনাকে বিলম্বিত করা এর লক্ষ্য। তা ছাড়া মহামারি মোকাবিলায় নিজের ব্যর্থতা ঢাকার লক্ষ্যে মহামারির উৎপত্তি অন্য দেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এর অন্য এক উদ্দেশ্য। ইউরোপের সঙ্গে ট্রাম্প যোগাযোগ বন্ধ করে দিলেও নিজে মহামারি মোকাবিলায় মার্কিন নাগরিকদের জন্য কিছুই করেননি। তিনি বলতে চান, বিপদ দেশীয় নয়, বাইরে থেকে আসা, ভেতর থেকে জন্ম নেয় না। ট্রাম্পের মতো ডানপন্থী রাজনীতিবিদেরা লকডাউনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁরা ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। সেটি তাঁরা খর্ব করতে চান না। অথচ তাঁদের ব্যবহার এবং যা ইচ্ছে তাই করার স্বাধীনতা থেকে অন্য মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। তারা অবৈজ্ঞানিক উক্তি করে অপপ্রচার করেছেন। নানা ধরনের ষড়যন্ত্র থিওরির জন্ম দিচ্ছেন। অথচ মহামারির আসল কারণ নিয়ে ভাবতে চাইছেন না। অনেকটা গ্রিক দেবতাদের মতো তারা তাকে ধোঁয়াশায় রাখার পক্ষপাতী। গ্রিক বা রোমান দেব-দেবী নানা আকার ধারণ করে মানুষকে ধোঁকা দেয়। নানা রকমের দুষ্কর্ম কাজ করে। গ্রিক দেবতাদের প্রধান জিউস কখনো রাজহাঁস হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। উদ্দেশ্য, সুন্দরী নারী লেডাকে বশীভূত করা। কখনো তিনি কাক হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন হেরাকে বশীভূত করার উদ্দেশ্যে। কখনো ষাঁড় হয়ে মর্ত্যলোকে এসেছেন সুন্দরী ইউরোপাকে ভোগ করতে। আমাদের দেব-দেবীরা (এদের মধ্যে রাজনীতিবিদ, বৃহৎ কোম্পানি, বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান) নানা রূপ নিয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হচ্ছে। নানা আদর্শের মোড়কে তারা তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইছে।

মৃত্যুভাবনা ও রাষ্ট্রের নজরদারি

মহামারির সঙ্গে মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মহামারি মৃত্যু নিয়ে আসে। কোভিড-১৯-এর কারণে বিশ্বব্যাপী ইতিমধ্যে লাখো মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। সব কালে সব সংস্কৃতিতে মৃত্যু বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হলেও মৃত্যু হচ্ছে মানবজীবনের সবচেয়ে বড় রহস্য। মৃত্যু অবধারিত কিন্তু তাকে আমরা উপেক্ষা করি। আমরা ভাবি, মৃত্যু আমাদের জীবনকে এড়িয়ে যাবে। মৃত্যু আমার জন্য নয়। এই দর্শনদৃষ্টিকে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত নানাভাবে নানা পথে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। মহাভারতে জীবন-মৃত্যুর ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠির মৃত্যুদেবতার নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। একটি প্রশ্ন ছিল, জীবনের সবচেয়ে বড় রহস্য কী। তার

উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, সবচেয়ে বড় রহস্য হচ্ছে দিনের পর দিন বহু মানুষ মৃত্যুর পথে পাড়ি দেয়। কিন্তু যারা বেঁচে থাকে, তারা অমর হয়ে থাকতে চায়, যেন মৃত্যু তাদের জীবনকে ছুঁবে না। দার্শনিক সমাজ যুগে যুগে মৃত্যুকে নিয়ে তাদের ভাবনা আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছে। মৃত্যু নিয়ে লুদবিগ উইটগেন্সটেইনের একটি উক্তি আছে। তিনি বলেছেন, 'Death is not an event in life'। ঠিক তারই প্রতিধ্বনি করে দার্শনিক মন্তাইনি বলেছেন, 'I shouldn't fear my own death, because when it happens, I won't be there (Death is the extinction of consciousness)। দার্শনিকদের এই উক্তিগুলো মৃত্যুকে একটি স্বাভাবিক জীবনপ্রক্রিয়া হিসেবে ভাবে। কিন্তু মহামারিকালে মৃত্যু স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে অনেকের জীবনে আসেনি, রাজনৈতিক এবং নৈতিক প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে। কোভিডের অধীনে জীবনমৃত্যুগত সিদ্ধান্ত আমাদের হাতে থাকেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে ইউরোপের নানা দেশে মহামারিতে আক্রান্ত রোগীদের বয়স বিচারে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুর সিদ্ধান্ত আজ ডাক্তার এবং রাষ্ট্র পরিচালকদের হাতে। তাঁদের নীতি হচ্ছে, কোভিড সেবায় বৃদ্ধদের প্রতি বেশি মনোযোগ না দিয়ে যারা যুবক, তাদের জীবনকে রক্ষা করা প্রাথমিক দায়িত্ব। বৃদ্ধরা সমাজের বোঝা। তারা সমাজকে কিছু দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। অর্থনীতিতে তাদের অবদান নেই। তাদেরকে হারালে অর্থনীতির কোনো ক্ষতি হয় না, বরং ভালো হয়। সে কারণে তাদের মৃত্যুকে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হিসেবে ভাবা সমীচীন নয়। বরং যারা শ্রমশক্তি, যারা মেধা এবং শক্তি দিয়ে সমাজকে ভবিষ্যতে কিছু দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তাদের বাঁচিয়ে রাখা প্রাথমিক নীতি হওয়া উচিত।

মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি কেবল মহামারিকালেই সম্ভব হয়। রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার, তাঁরা মানুষের মধ্যে আতঙ্কের বীজ রোপণ করে। মৃত্যুর সামনে মানুষকে জিম্মি করে রাষ্ট্র বলতে চায়, একমাত্র রাষ্ট্রের ক্ষমতা আছে জনগণকে মহামারি থেকে বাঁচানো। রাষ্ট্র নানা নির্দেশনামা জারি করে। রাষ্ট্র মহামারির ধ্বংসক্ষমতা তুলে ধরে নাগরিক সমাজকে তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। মানুষের পক্ষে তার স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং অনেকটা অবচেতনভাবে রাষ্ট্রের হাতে নিজের নিরাপত্তা ন্যস্ত করে। দার্শনিক টমাস হবস বলেছিলেন, নিরাপত্তার কথা ভেবে আমাকে আমার স্বাধীনতা বিসর্জন দিলেও দিতে হতে পারে। প্রয়োজন শক্তিশালী রাষ্ট্র যে আমাকে রক্ষা করবে। রাষ্ট্র এই সুযোগে নাগরিক সমাজের ওপর তার নজরদারি বৃদ্ধি করছে। রাষ্ট্র নামের প্রতিষ্ঠান নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, স্বাস্থ্য রক্ষার নামে মানুষকে সরকারের শাসননীতির বাঁধনে আরও শক্ত করে বাঁধতে চাইছে। সরকার নানা ধরনের জাতীয় নীতি প্রবর্তন করে মহামারির আড়ালে মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করছে। মহামারির দোহাই দিয়ে

অনেক দেশে নাগরিক স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। ফরাসি দার্শনিক ফুকো বেঁচে থাকলে হয়তো বলতেন, এসব তৎপরতা মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করার কৌশলমাত্র, শৃঙ্খলা রক্ষার দোহাই দিয়ে রাষ্ট্র মানুষকে শাসন করতে চায়। আজ ইলেকট্রনিক নানা মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষের চলাফেরার প্রতিটি মুহূর্ত আজ সরকারের নজরদারিতে পড়ছে। চীন, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া টেকনোলজি এবং বিগ ডেটা সংগ্রহ করে রাষ্ট্রের হাতকে শক্তিশালী করছে। মহামারির দোহাই দিয়ে আমরা আজ এমন এক যুগে প্রবেশ করেছি, যাকে অরওয়েলিয়ান (জর্জ অরওয়েলের নামানুসারে) যুগ বলে। সেখানে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নজরদারি প্রবল। পশ্চিমা বিশ্ব এই প্রবাহে তার উদারনীতির কিছু অংশ বিসর্জন দিতে বাধ্য হবে। আজ রাষ্ট্র অনেক বেশি কর্তৃত্ববাদী, একনায়কতান্ত্রিক। সে কারণে ব্যক্তিস্বাধীনতার দিকগুলো আজ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

নাওমি ক্লেইন তাঁর *দ্য শক ডকট্রিন: দ্য রাইজ অব ডিজাস্টার ক্যাপিটালিজম* গ্রন্থে বলছেন, যখন বিশৃঙ্খলা সমাজব্যবস্থায় ধস নামায়, তখন ওই সামাজিক হট্টগোলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করার মোক্ষম সুযোগ সৃষ্টি হয়। মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার দোহাই দিয়ে বিশ্বব্যাপী বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকার অর্থনীতিতে বিশাল মাপের পরিবর্তন এসেছিল যখন যুদ্ধ, ব্যাপক দুর্নীতি, অর্থনীতিতে ধস, অসাম্যের প্রসার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজকে দুর্বল করে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়াতে ঠিক এই অবস্থা বিরাজমান। সম্ভবত সবচেয়ে রক্ষণশীল সরকার এখন এখানে ক্ষমতায়। এ দেশের অর্থমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী রেগানমিক্স এবং থ্যাচার ধাঁচের অর্থনীতি প্রবর্তনের কথা প্রকাশ্যে বলছেন। যেসব নীতি তাঁরা প্রবর্তন করতে চান, সেগুলোর মধ্যে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং আয়করের ক্ষেত্রে সংস্কার, বেতন বৃদ্ধি বন্ধ করা, শিল্প শ্রম আইনে সংস্কার এবং পাবলিক খরচ কমিয়ে আনা অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের মূল কথা বেকারত্ব কমানো এবং প্রবৃদ্ধি। কিন্তু এই নীতিগুলো বাস্তবায়নের পথে যেসব পরিবর্তন আনা হচ্ছে, তাদের মধ্যে পরিবেশদূষণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য, পুঁজি বিনিয়োগের দরখাস্ত দ্রুত পাস করে দেওয়া, শ্রমিকের শ্রমঘণ্টা কমিয়ে শ্রমের অস্থায়ীকরণ ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে (আমদানি করা কয়লা কারখানাকে দ্রুত অনুমতি দেওয়া)। একই সঙ্গে এবিসির মতো নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যমের অনুদান কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফি সংস্কার করা হচ্ছে যেন সামাজিক, মানবিক বিভাগে ফির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বিজ্ঞান বিভাগে ফি হ্রাস পায়। প্রতিরক্ষা খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ ঘটছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে সীমাহীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সাংবাদিকদের নাজেহাল করা এবং গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের মতো মানুষকে কোনো সহায়তা দেওয়া হচ্ছে না।

এভাবে মহামারিকালে এমন এক রাষ্ট্রের জন্ম হচ্ছে, যে রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করে এমন এক সমাজের জন্ম দিতে চায়, যেখানে রাষ্ট্র অনেক বেশি কর্তৃত্ববাদী। সোভিয়েত রাষ্ট্র বা চীনের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমালোচনা করলেও আজ গণতন্ত্রের ধারক পশ্চিমা বিশ্ব ঠিক ওই ধরনের রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

শেষ কথা

কোভিড-১৯ নামের মহামারি থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। প্রথমত, এই মহামারি পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সমাজব্যবস্থার অসারতা এবং সবচেয়ে দুর্বল দিক উন্মোচন করতে সাহায্য করেছে। মহামারি পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থাকে অচল করে দিয়ে প্রমাণ করেছে যে ওই ব্যবস্থা যে দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেটি ভুল। মার্ক্স বহু আগে বুর্জোয়া সমাজের অতি ক্ষুদ্র একটি উপাদান 'পণ্য' দিয়ে তার *ক্যাপিটাল* গ্রন্থ শুরু করেছিলেন। পণ্যের মধ্যে তিনি ঘনীভূত আকারে বুর্জোয়া সমাজের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য পুঞ্জীভূত থাকতে দেখেন। *ক্যাপিটাল* শুরু হয়েছে এভাবে, 'পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় সমাজের সম্পদ বলতে বিপুল পরিমাণে পণ্য মজুতকে বোঝায়। বিচ্ছিন্নভাবে যেকোনো পণ্য ওই ব্যবস্থার প্রাথমিক আকার। বুর্জোয়া অর্থনীতির ভিত পণ্য। পুঁজিবাদের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা। তার জন্য যে পরিস্থিতি বা পরিবেশের প্রয়োজন হয়, বুর্জোয়ারা সেটি তৈরি করে এবং টিকিয়ে রাখে। সে কারণে পণ্যের অভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের বাঁধনগুলো একের পর এক উন্মোচন করা এবং ওই ব্যবস্থার বিশাল ইন্দ্রজালকে স্বচ্ছ করে তোলা মার্ক্সের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

কোভিড বিশ্বব্যাপী যোগাযোগব্যবস্থাকে স্তব্ধ করে দিয়ে এবং প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারকে সাময়িকভাবে এবং আংশিকভাবে অচল করে দিয়ে দেখিয়েছে যে মানুষের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজিবাদকে শায়েস্তা করা সম্ভব। বিশ্বায়ন এবং পুঁজিবাদ মানুষের চাহিদা, স্বার্থপরতাকে সার্বক্ষণিকভাবে উসকে দিয়ে টিকে থাকে এবং শোষণের প্রক্রিয়া চালু রাখে। মানুষের পণ্যচাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজিবাদকে ঘায়েল করা আজ একমাত্র পথ। শ্রমিক আন্দোলনের পাশাপাশি মানুষের নৈতিক জগতে ভোগবাদের বিপরীত ধারা জাগ্রত করার নতুন আন্দোলন পুঁজিবাদকে রুখে দেওয়ার অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে বলে ধারণা করি।

দ্বিতীয়ত, সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া কোভিড-১৯ মহামারির উপযুক্ত সমাধান বের করা সম্ভব হয়নি। ভ্যাকসিন উদ্ভাবনে ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত ল্যাবরেটরি অবদান রেখেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাইরাস প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন বিতরণ এবং ভ্যাকসিন টিকা দেওয়ার অবকাঠামো সরকার ছাড়া ব্যক্তিমালিকানা পর্যায়ে সম্ভব নয়। শ্রমিক ছাঁটাই থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার

অনুদান দিয়ে রাষ্ট্র অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্য খাতে সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে জনগণকে মহামারির হাত থেকে বাঁচিয়েছে। যেকোনো রাষ্ট্রের জন্য এই সমস্যাগুলো মৌলিক কিন্তু এই ধাক্কা সামলাতে বাজার অর্থনীতি ব্যর্থ হয়েছে। সরকারকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। এতে করে প্রমাণিত হয় ব্যক্তি খাতের ওপর মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বাসস্থান ন্যস্ত করা মানবনীতিবিরোধী।

তৃতীয়ত, কোভিড মহামারি আরও প্রমাণ করেছে যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যতীত বৈশ্বিক সমস্যার সমাধান নেই। সামাজিক অসাম্য, জলবায়ু, আবহাওয়াসহ সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান বৈশ্বিক উদ্যোগ নিয়ে সম্পন্ন করতে হবে।

চতুর্থত, বিশ্বব্যাপী বৃহৎ কোম্পানি এবং করপোরেট দুনিয়ার ক্ষমতা কমেনি। আমাজন নামের মার্কিন কোম্পানির আয় মহামারিকালে কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন বিলিয়নিয়ারদের আয় ৫৬৫ বিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের সময় পরিবর্তন আশা করা হয়েছিল। কিন্তু নিও লিবারেল অর্থনীতি বদলায়নি, বিপরীতে বেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মহামারি প্রমাণ করেছে মুক্তবাজার অর্থনীতি (Free Market Economy) মুনাফা চায়, মানবিক ট্র্যাজেডির সমাধান চায় না।

পঞ্চম, বিশ্বায়ন যে আকারে ও প্রকারে এগিয়ে চলেছে, তার সেই গতিতে পরিবর্তন আনা অপরিহার্য। বর্তমানকালীন বিশ্বায়ন মহামারির জন্য অনেকখানি দায়ী। যে বৈশ্বিক সংহতির ধারণা (Cosmopolitan) দার্শনিক কান্ট, লাইবনিজ এবং হিউমের দর্শনে লক্ষ করি, তার ধার কমে গেছে। আজ আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার সময় এসেছে।

সবশেষে, কোভিড-১৯ ইঙ্গিত করছে, আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হবে। আমাদের চাওয়া-পাওয়া কী, তার পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। মহামারি থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ পুনর্নির্ধারণ করা জরুরি। বিশ্ব পুঁজিবাদ এই মহামারির জন্য দায়ী। সে কারণে আজকের দিনের একমাত্র বিকল্প বৈশ্বিক পর্যায়ে সমাজবাদী ধারণার প্রত্যয়ন।

গ্রন্থপঞ্জি

Chomsky, Noam on COVID-19 : The latest massive failure of neoliberalism, *EURATIV*.com

Dean, Will. Covid-19 and 100 days that transformed the world : the 17 April edition of *The Guardian*, 15 April, 2020

Freedland, Jonathan. Covid-19 has unmasked the true nature of Donald Trump and Trumpism, *The Guardian*, 10 October, 2020

Gillick, Liam. Reeilding Capitalism : Covid-19 and the rebooting of Australia's neoliberal order, *ARENA online.*

Horton, Richard. Covid-19 has exposed the reality of Britain : poverty, insecurity and inequality, *The Guardian*, 8 September 2020

Isakovic, Nela Porobic. COVID-19 What has COVID-19 taught us about Neoliberalism? *WILPF Journal*, 23 March, 2020.

Johnson, Carol. Has coronavirus killed ideology? No, it's just cycled it around again, *The Conversation*, 20 April, 2020.

Karnad, Raghu. The experience of Covid-19 shows how easily catastrophe can befall our.., *The Guardian*, 29 August, 2020

Kuo, Lily. Birth of a pandemic : inside the first weeks of the coronavirus outbreak in Wuhan, *The Guardian*, 10th April 2020.

McCloskey, Stephen. COVID-19 has exposed neoliberal-driven 'Development' : How can development education respond? *Journal Policy & Practice*, Centre for Global Education, Spring 2020.

Maylam, Paul, A Post-pandemic world is unlikely to focus on meeting need over human greed.; *The Conversation*, July 1, 2020

Navarro, Vicenta, The Consequences of Neoliberalism in the Current Pandemic, *International Journal of Health Services*, 2020 July, 50(3) : 271-275

Quiggin, John. COVID-19 highlights failures of neoliberalism and privatisation, *Independent Australia*, 19 May 2020.

Rafi Hossain & Shakil Ahmed, A Case for building a stronger health care system in Bangladesh, *World Bank News* July 26, 2020

Saad-Filho, Alfredo. From COVID-19 to the End of Neoliberalism, Critical Sociology, 29 May, 2020

Sparrow, Jeff. Conservatives once championed the sacredness of every human life - until now. 2020

Szymborska, Hanna "Coronavirus recovery - the new economic thinking we need" in *The Conversation* July 8, 2020

Warburton, Nigel Philosophical responses to the coronavirus, 2020

Wintour, Patrick. Coronavirus : who will be winners and losers in new world order? *The Guardian*, 11 April, 2020

রাজনীতি

বর্ণবাদ, স্বাস্থ্যবৈষম্য এবং অতিমারি : যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গ

হাফিজা বেগম

সারসংক্ষেপ

করোনাভাইরাস অতিমারি বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য বিপর্যয় এবং অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করলেও যুক্তরাষ্ট্রে এর অভিঘাত এবং পরিণাম হয়েছে অধিকতর প্রাণঘাতী ও বিপর্যয়কর। এই সংকটে সব বর্ণ এবং জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বিপর্যস্ত হলেও আফ্রিকান আমেরিকান জনগোষ্ঠী এই মহামারিসৃষ্ট স্বাস্থ্যসংকট এবং আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে অন্যদের চেয়ে বেশি পড়েছে। আফ্রিকান আমেরিকানদের কোভিড-১৯ জনিত মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি, সেই সঙ্গে তারা আর্থিক সংকটে সর্বাধিক বিপর্যস্ত। এই জনগোষ্ঠীর ওপর অতিমারির বর্ণভিত্তিক অসম পরিণামের কারণ অনুসন্ধানের জন্য এই নিবন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় টিকে থাকা অসমতা ও বৈষম্য, আফ্রিকান আমেরিকানদের স্বাস্থ্য অবস্থার নিম্নমান এবং এর ফলাফলের (হেলথ আউটকাম) জন্য দায়ী মৌলিক কারণ ও অন্তর্নিহিত অবস্থা চিহ্নিত করা হবে। পাশাপাশি এসব উপাদানের আন্তসম্পর্কের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করাও এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। সে জন্য প্রথমত ঐতিহাসিক কাঠামোগত প্রক্রিয়া, অর্থাৎ বর্ণের ভিত্তিতে আবাসিক এলাকার পৃথক্‌করণ এবং আফ্রিকান আমেরিকান জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যে এর সুদূরপ্রসারী পরিণাম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত কীভাবে এই প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারককে অসমতা সৃষ্টি করে স্বাস্থ্যবৈষম্য বজায় রাখে এবং আফ্রিকান আমেরিকানদের অসম স্বাস্থ্য ফলাফলে অবদান রাখে, তা-ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমগ্র বিশ্লেষণে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে আফ্রিকান আমেরিকান জনগোষ্ঠীর ওপর অতিমারির অসমানুপাতিক পরিণামের পটভূমি যেমন ঐতিহাসিক ও কাঠামোগত উপাদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তেমনি এর কারণ নিহিত রয়েছে তাদের অসম আর্থসামাজিক অবস্থা ও স্বাস্থ্যবৈষম্যে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

অতিমারি, করোনাভাইরাস, বর্ণবাদ, বর্ণবৈষম্য, স্বাস্থ্যবৈষম্য, বর্ণভিত্তিক পৃথক্‌করণ, সামাজিক নির্ধারক, কাঠামোগত প্রক্রিয়া, স্বাস্থ্য অবস্থা, স্বাস্থ্য ফলাফল।

ভূমিকা

করোনাভাইরাস অতিমারি বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য বিপর্যয় এবং অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করলেও যুক্তরাষ্ট্রে এর অভিঘাত এবং পরিণাম হয়েছে অধিকতর প্রাণঘাতী ও বিপর্যয়কর। যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে করোনাভাইরাস মহামারির প্রকোপ ও ভয়াবহতা নজিরবিহীন, ফলে দেশটি শতাব্দীর এক ভয়ংকর জনস্বাস্থ্যসংকটে পড়েছে। এই সংকটে সব বর্ণ এবং জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বিপর্যস্ত হলেও সরকারি-বেসরকারি সব তথ্য, উপাত্ত, গবেষণা সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করে যে অশ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী—আফ্রিকান আমেরিকান, হিস্পানিক এবং ন্যাটিভ আমেরিকান অসমানুপাতিক হারে এই মহামারি সৃষ্ট স্বাস্থ্যসংকট এবং আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে [(সিডিসি(ক) ২০২০; সিডিসি(ঘ) ২০২০; এপিএম ২০২০; ব্যারানুকাস ও স্টেবিন্স ২০২০; ওপেল ও অন্যান্য ২০২০]। অতিমারির প্রারম্ভে কয়েকটি রাজ্যের প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত করোনাভাইরাসে সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হারে যে বর্ণ ও জাতিভিত্তিক পার্থক্য নির্দেশ করে, পরে তার ক্রমাগত ধারাবাহিকতা যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে চলতে থাকে। এশীয় ব্যতীত এ পর্যন্ত (ডিসেম্বর ২০২০) যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যায় প্রতিটি অশ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ অনুপাতের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি হারে মৃত্যুবরণ করেছে এবং এখনো এই প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে (এপিএম ২০২০)।

এপিএম রিসার্চ ল্যাব (২০২০) যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে সব মৃত্যুর উপাত্ত সংকলন এবং বর্ণ ও জাতিগত পরিচয় অনুযায়ী বিন্যস্ত তথ্য হালনাগাদ করে দেখায় যে যুক্তরাষ্ট্রের সব প্রধান বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আফ্রিকান আমেরিকানদের মৃত্যুর হার সর্বোচ্চ। নিজ নিজ বর্ণ ও জাতির প্রতি এক লাখে আফ্রিকান আমেরিকান ১২৪ জন, হিস্পানিক ৮৭ জন, শ্বেতাঙ্গ ৭৬ জন এবং এশিয়ান ৫২ জন কোভিড-১৯ সম্পর্কিত অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করে (এপিএম ২০২০)। জুন মাস (২০২০) নাগাদ যে ৪৭টি রাজ্যের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত মৃত্যুর বর্ণ ও জাতিগত পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে ৩৫টি রাজ্যে এই জনগোষ্ঠীর মানুষ অসমানুপাতিক হারে (প্রতি রাজ্যের জনসংখ্যায় নিজ অনুপাতের চেয়ে অধিক) প্রাণ হারিয়েছে (ব্যারানুকাস ও স্টেবিন্স ২০২০)। মহামারি প্রাদুর্ভাবের পর মে মাস নাগাদ মিশিগান ও ইলিনয় রাজ্যে তারা মোট কোভিড-১৯ মৃত্যুর যথাক্রমে ৪১ এবং ৩৩ শতাংশের জন্য দায়ী, উভয় রাজ্যের জনসংখ্যায় তাদের অংশ মাত্র ১৪ শতাংশ (মিশিগান ২০২০,ইলিনয় ২০২০)। জুলাই মাসে যখন যুক্তরাষ্ট্রে কোভিড-১৯ মৃত্যুর হার প্রতি লাখে ৩৯ জন, দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য লুইজিয়ানায় এই হার ছিল প্রতি লাখে ৭২ জন, অথচ এই রাজ্যের আফ্রিকান আমেরিকান-অধ্যুষিত ৭টি কাউন্টিতে মৃত্যুর হার ছিল ১২৬ থেকে ২০৫ জন (ব্যারানুকাস ও স্টেবিন্স ২০২০)। এই অঞ্চলের অপর রাজ্য জর্জিয়ায় চারটি আফ্রিকান আমেরিকান প্রধান কাউন্টির অধিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সর্বোচ্চ হারে প্রাণ

হারিয়েছে, প্রতি লাখে ৩৮৭ জন, যখন এই রাজ্যে এবং সমগ্র দেশে প্রতি লাখে প্রাণহানি ছিল যথাক্রমে ২৯ এবং ৩৯ জন (ব্যারানুকাস ও স্টেবিন্স ২০২০)। একই প্রবণতা দেখা যায় শুরুতে করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের প্রধান কেন্দ্র নিউইয়র্ক শহরে। এখানে হিস্পানিক এবং আফ্রিকান আমেরিকান জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত তিনটি কাউন্টিতে সর্বোচ্চ হারে প্রাণহানি হয়েছে (মেস ও নিউম্যান ২০২০)। এই দুই জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত নিম্ন আয়ের এলাকাগুলোতে সংক্রমণ ও মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি ছিল (বুকানান ও অন্যান্য ২০২০)।

কোভিড-১৯ জনিত জটিলতা ও মৃত্যুর সঙ্গে অধিক বয়সের সংশ্লিষ্টতা থাকলেও [(সিডিসি(ক) ২০২০] সব বয়সীদের মধ্যে আফ্রিকান আমেরিকান ও হিস্পানিকদের মৃত্যুহার অনেক বেশি, যদিও তাদের গড় বয়স তুলনামূলকভাবে কম, যথাক্রমে ৩৪ এবং ৩০ বছর (ফোর্ড ও অন্যান্য ২০২০)। শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় (গড় বয়স ৪৪ বছর) কম বয়সে তাদের প্রাণহানির সংখ্যা অধিক। বিশেষ করে আফ্রিকান আমেরিকান জনগোষ্ঠীর কোভিড-১৯ সম্পর্কিত প্রাণহানি বয়সের প্রতিটি ভাগে যে হারে হচ্ছে, সেই হারে শ্বেতাঙ্গদের মৃত্যু ১০ বছর বেশি বয়সে হচ্ছে (ফোর্ড ও অন্যান্য, ২০২০)।

কোভিড-১৯ সম্পর্কিত অসুস্থতা এবং প্রাণহানি ছাড়াও তীব্র অর্থনৈতিক সংকট আফ্রিকান আমেরিকান জনগোষ্ঠীকে সর্বাধিক হারে বিপর্যস্ত করছে (গেটাচু ও অন্যান্য, ২০২০)। সব মার্কিন নাগরিকের একটি বড় অংশ অতিমারির ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা ও বেকারত্বের কঠিন চাপের সম্মুখীন হলেও প্রাক্-অতিমারি কাল থেকে নানা প্রতিকূল অবস্থায় থাকা ৬০ শতাংশ আফ্রিকান আমেরিকান জনগোষ্ঠী উপার্জন হারিয়ে বা পারিবারিক আয় কমে যাওয়ায় গুরুতর আর্থিক সংকটে পতিত হয়েছে (এনপিআর, হার্ভার্ড ২০২০)। ভিন্ন প্রতিকূলতা এবং সীমাবদ্ধতা থাকায়, বিশেষ করে এই জনগোষ্ঠীর সার্বিক আর্থসামাজিক এবং স্বাস্থ্য অবস্থার প্রেক্ষাপটে অতিমারির অভিঘাতের এই বিপর্যয়কারী পরিণাম অনেকটা অনুমেয় ছিল। করোনাভাইরাস অতিমারি এই অসম বর্ণভিত্তিক পরিণাম সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় বিদ্যমান অসমতা, সীমাবদ্ধতা এবং বর্ণ ও জাতিগত বৈষম্য সামনে নিয়ে এসেছে।

উদ্দেশ্য

যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান পাঁচটি বর্ণ ও জাতিভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে শ্বেতাঙ্গ ৬০.১%, হিস্পানিক ১৮.৫%, আফ্রিকান আমেরিকান বা ব্ল্যাক ১৩.৪%, এশিয়ান ৫.৯% এবং ন্যাটিভ আমেরিকান ও আলাস্কার আদিবাসী ১.৩% (কুইক ফ্যাক্টস ২০১৯)। যদিও প্রায় সব অশ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী অতিমারির অভিঘাতে অসমানুপাতিক হারে বিপর্যস্ত, কিন্তু আফ্রিকান আমেরিকান জনগোষ্ঠীর ইতিহাস এবং জীবন অভিজ্ঞতার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের কারণে এই নিবন্ধে কেবল তাদের ক্ষেত্রে অতিমারির অসম পরিণামের কারণগুলোর

বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষায় নজর দেওয়া হবে। এই জনগোষ্ঠী ৪০০ বছর ধরে প্রথমে ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা মূলত সতেরো শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ আফ্রিকান জনগোষ্ঠীর বংশধর। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ এবং ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে আসা অভিবাসীরাও এই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় আফ্রিকান আমেরিকানদের ৫৮ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্যগুলোতে বাস করে (ওএমএইচ)।

অপর দিকে বৃহত্তম অশ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী হিস্পানিকরা মূলত ক্যারিবীয় অঞ্চল, দক্ষিণ ও সেন্ট্রাল আমেরিকা থেকে আসা এবং সিংহভাগ প্রথম প্রজন্মের অভিবাসী (ওএমএইচ)। আফ্রিকান আমেরিকানদের ঐতিহাসিক পটভূমি ও বর্ণবৈষম্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং এর ধারাবাহিকতার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের অন্য যেকোনো অভিবাসী জনগোষ্ঠী থেকে তারা সম্পূর্ণ আলাদা; সব মানদণ্ডে সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত, নিম্নমানের স্বাস্থ্যসুবিধা এবং এর ফলাফলের কারণে সবচেয়ে কম স্বাস্থ্যবান জনগোষ্ঠী।

অতিমারি আফ্রিকান আমেরিকাদের নিম্নমানের স্বাস্থ্যসুবিধা, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিদ্যমান অসমতা ও বৈষম্য উন্মোচন করায় এর মূলে নিহিত কারণ অনুসন্ধানের যৌক্তিকতা রয়েছে। এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যবৈষম্য ও অসমতা সৃষ্টিকারী মৌলিক কারণসমূহ এবং এসব কারণের জন্য দায়ী উপাদানগুলোর আন্তসম্পর্ক বিশ্লেষণ করা। আফ্রিকান আমেরিকানদের ওপর অতিমারির বর্ণভিত্তিক অসম পরিণামের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় টিকে থাকা অসমতা ও বৈষম্য, আফ্রিকান আমেরিকানদের নিম্নমানের স্বাস্থ্যসুবিধা এবং এর ফলাফলের (হেলথ আউটকাম) জন্য দায়ী মৌলিক কারণ ও অন্তর্নিহিত অবস্থা চিহ্নিত করা এবং এসব উপাদানের আন্তসম্পর্কের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা। কীভাবে ঐতিহাসিক কাঠামোগত উপাদান, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অবস্থা এবং অন্যান্য অনুষঙ্গ স্বাস্থ্য অসমতায় অবদান রেখে আফ্রিকান আমেরিকানদের যেকোনো প্রাকৃতিক ও মানবিক সংকটের মুখে অনিরাপদ আর ঝুঁকিগ্রস্ত রাখে, তা উপলব্ধি করা। যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্যবৈষম্য-সম্পর্কিত বিদ্যমান গবেষণাকর্ম, বিশ্লেষণ ও তথ্য-উপাত্ত প্রয়োজন এবং লভ্যতা সাপেক্ষে পর্যালোচনা ও ব্যবহার করে আফ্রিকান আমেরিকানদের স্বাস্থ্য অবস্থা এবং অতিমারির অসমানুপাতিক পরিণতির উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

আফ্রিকান আমেরিকান ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যকার স্বাস্থ্যবৈষম্যের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে আড়াই শ বছর স্থায়ী দাসপ্রথা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সতেরো ও আঠারো শতকজুড়ে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে লাখ লাখ মানুষকে অপহরণ করে, ব্রিটিশ আমেরিকা উপনিবেশে তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে প্রজন্ম প্রজন্ম ধরে দক্ষিণ

অঞ্চলের কৃষি খামারে শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়। তারা তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশধরসহ দাসমালিকদের চিরস্থায়ী ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। দাসত্ব নৈতিক, আইনগত ও সামাজিকভাবে সমর্থিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে থাকে। দাসপ্রথা প্রতিষ্ঠার দেড় শ বছর পর স্বাধীনতা লাভ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও দাসপ্রথা অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে অব্যাহত থাকে। প্রায় ১০০ বছর পর দাসপ্রথা বিলুপ্তবাদী এবং এই প্রথা বজায় রাখার পক্ষের সংঘাত যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের প্রধান অনুঘটক হয়। গৃহযুদ্ধের অবসান হলে ১৮৬৩ সালে দাসদের মুক্তি ঘোষিত হয় এবং ১৮৬৫ সালে আইনগতভাবে দাসপ্রথার অবসান হয়।

দাসপ্রথার অনিবার্য পরিণতি ছিল স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বর্ণভিত্তিক বিভাজন ও বৈষম্য। অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম, জীবনযাপনের অতি নিম্নমান এবং স্বাস্থ্যসেবার অভাবে উচ্চ হারে অসুস্থতা এবং অকালমৃত্যু ছিল দাসজীবনের বৈশিষ্ট্য (হ্যামন্ডস ও রিভারবি ২০১৯)। যুক্তরাষ্ট্রে ১৮০৮ সালে আফ্রিকান দাস আমদানি নিষিদ্ধ হলে প্রাকৃতিকভাবে দাসদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকার, দাসমালিক এবং শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসক গর্ভবতী মাতৃস্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হয় (আরবান হেলথ ২০১৯, ব্যাকিন্সকি ২০১৮)। দাসপ্রথা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই মনোযোগ বিচ্যুত হয়। ফলে মাতৃ এবং নবজাতকের মৃত্যুর উচ্চ হার সাধারণ প্রবণতায় পরিণত হয়, যা বিস্ময়করভাবে এখনো অব্যাহত আছে।

গৃহযুদ্ধের পর পুনর্গঠনের ব্যর্থতা এবং সমাজে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বর্ণবাদ ও দাসদের অধস্তনতার পুরাকথা ইত্যাদি কারণে মুক্ত দাসদের জীবন দরিদ্রতা, আশ্রয় ও কর্মহীনতা এবং নানা রোগব্যাধি গ্রাস করে। কৃষি খামারভিত্তিক আবাসন ও কর্ম হারিয়ে অধিকাংশ আফ্রিকান আমেরিকান দক্ষিণ অঞ্চলের শহরগুলোতে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় বাস করতে বাধ্য হয়। দাসপ্রথা অবসানের অব্যবহিত পরেই দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্যগুলোতে জিম ক্রো আইন কার্যকর করে সব ক্ষেত্রে বর্ণভিত্তিক পৃথক্‌করণ আইনসম্মত করা হয়। পরবর্তী ১০০ বছর এই আইন, ব্ল্যাক কোড এবং নিবর্তনমূলক চুক্তি আফ্রিকান আমেরিকানদের ভোটাধিকার অস্বীকার করে, কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা রুদ্ধ করে তাদের প্রান্তীকরণ করা হয়। জিম ক্রো আইন এবং ব্ল্যাক কোডের মাধ্যমে হাসপাতাল ও চিকিৎসাব্যবস্থার কঠোর পৃথক্‌করণ করে আফ্রিকান আমেরিকানদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার বাইরে রাখা হয় (আরবান হেলথ ২০১৯)। ফলে শহরাঞ্চলের সম্পূর্ণ পৃথক এলাকায়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসরত আফ্রিকান আমেরিকানরা নানা সংক্রামক রোগের মহামারিতে সবচেয়ে বেশি প্রাণ হারায় (হ্যামন্ডস ও রিভারবি ২০১৯)। অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত, মহামারিতে পর্যুদস্ত এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠীর পক্ষে স্থানীয় বা ফেডারেল পর্যায়ে তাদের স্বাস্থ্যসংকটের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। ফলে উনিশ ও বিশ শতকের সম্পূর্ণ সময় তারা স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত থাকে এবং ভগ্ন স্বাস্থ্যই তাদের পরিণতি হয় (হ্যামন্ডস ও রিভারবি ২০১৯)।

এই অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয় ১৯৬০-এর দশকে, যখন বর্ণবাদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের চাপে পৃথক্‌করণের আইন ও নিবর্তনমূলক চুক্তি বাতিল করা হয়। এই সময়ে নাগরিক অধিকার আইন পাস হয় এবং হাসপাতাল, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৃথক্‌করণ নিষিদ্ধ করা হয়। সেই সঙ্গে মার্কিন জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি সম্প্রসারণের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি কর্মসূচি মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার প্রবর্তিত হয়, ফলে আফ্রিকান আমেরিকানদের স্বাস্থ্য অবস্থায় পরবর্তী দশকগুলোতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

এই পরিবর্তন সত্ত্বেও আফ্রিকান আমেরিকানদের স্বাস্থ্য সমতা অর্জন এখনো সম্ভব হয়নি। একটি সময়ে দাসপ্রথা এবং প্রত্যক্ষ বর্ণবাদের অবসান হলেও এর রেশ এখনো স্বাস্থ্যব্যবস্থায় টিকে আছে (টমাস ও ক্যাসপার ২০১৯)। কঠোর পৃথক্‌করণ থেকে এই ব্যবস্থা যে বিবর্তিত হয়ে অসমতাপূর্ণ ও বিভাজনমূলক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে, তা বিগত কয়েক দশকে প্রকাশিত বিভিন্ন সরকারি অনুসন্ধানী গবেষণা প্রতিবেদন প্রমাণ করে। এই সব প্রতিবেদন আফ্রিকান আমেরিকান জনগোষ্ঠী লব্ধ স্বাস্থ্যসেবার পরিমাণ ও গুণগত মানে কতটা পিছিয়ে, তার নজির তুলে ধরে সমগ্র স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় বিদ্যমান বর্ণভিত্তিক বৈষম্যের স্থায়ী চিত্র প্রকাশ করে (হেকলার রিপোর্ট ১৯৮৫; আনইকুয়াল ট্রিটমেন্ট ২০০৩)।

স্বাস্থ্যবৈষম্য বিষয়ে গবেষণা এবং তত্ত্বগত কাঠামো

যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণ এবং জাতিভিত্তিক স্বাস্থ্যবৈষম্য শত শত বছরের প্রাচীন সমস্যা হলেও সুদীর্ঘ কাল স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসাসেবায় বর্ণ ও জাতিগত পার্থক্য একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হতো না। বিংশ শতাব্দীর অনেকটা সময় আফ্রিকান আমেরিকানদের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিষয়টি আমেরিকান জনস্বাস্থ্য ও সমাজবিজ্ঞানের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল না। ষাটের দশকে নাগরিক অধিকার আন্দোলন স্বাস্থ্যবৈষম্য রাজনৈতিক পাদপ্রদীপে নিয়ে আসে এবং নতুন একাডেমিক শাখা হিসেবে স্বাস্থ্যসেবাবিষয়ক গবেষণার আবির্ভাব হয়। সাম্প্রতিক কালে এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা, আলোচনা ও রাজনৈতিক বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টির গুরুত্ব ও মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

যেকোনো জনগোষ্ঠীর কল্যাণ, গতিশীলতা, কর্মক্ষমতা এবং জীবনের মান উন্নয়নে স্বাস্থ্যসমতা অত্যন্ত জরুরি। স্বাস্থ্যসমতা এমন একটি অবস্থা, যখন প্রত্যেকের পূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা লাভের সুযোগ থাকে এবং এই সুবিধা লাভ করতে কেউ সামাজিক স্থান বা সামাজিকভাবে নির্ধারিত পরিস্থিতির কারণে সুবিধাবঞ্চিত বা অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকে না। সন্তোষজনক স্বাস্থ্য লাভের জন্য প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীভেদে পদ্ধতিগত পার্থক্য স্বাস্থ্যবৈষম্য সৃষ্টি করে, যার ফলে স্বাস্থ্যব্যবস্থায় অন্যায্য পার্থক্য সৃষ্টি হয় (কমিউনিটিস ইন অ্যাকশন ২০১৭)। যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্য খাতের অবস্থায় (হেলথ

স্ট্যাটাস) ও ফলাফলে (হেলথ আউটকাম) বর্ণভিত্তিক পার্থক্য বিশ্লেষণে প্রধানত দুটি ধারা দেখা যায়। প্রথমত, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেকটা একচেটিয়া দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে স্বাস্থ্যে বিদ্যমান এবং দৃশ্যমান যেকোনো বর্ণভিত্তিক পার্থক্যের কারণ বর্ণভিত্তিক জনগোষ্ঠীর প্রকৃতি প্রদত্ত জৈবিক (বায়োলজিক্যাল) পার্থক্য। এই মত অনুযায়ী সহজাত ও প্রকৃতিজাত বৈশিষ্ট্য প্রকৃতপক্ষে বর্ণভিত্তিক পার্থক্য, আফ্রিকান আমেরিকানদের অধনস্ততা, দাসত্ব বন্ধন এবং স্বাস্থ্যে বর্ণভিত্তিক পার্থক্যের মূল কারণ (ক্রিগার ১৯৮৭)। আফ্রিকান আমেরিকান জন্মগতভাবে দৈহিক অপূর্ণতা বা দুর্বলতার কারণে অধিক রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে, সামাজিক বা অন্য কোনো কারণে না (রোডার ২০১৭)।

স্বাস্থ্যে বর্ণভিত্তিক বৈষম্যের ব্যাখ্যায় জিন বা জৈবিক বিশেষত্বের ওপর এত গুরুত্ব দেওয়া হতো, যাতে তা সমাজে আদর্শগত কাজ করে এবং রোগের সামাজিক উৎস থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখে (কুপার ও অন্যান্য ২০০৩), সেই সঙ্গে বর্ণভিত্তিক অধস্তনতার সামাজিক বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে, যাতে স্থিতাবস্থা রক্ষা করা সহজ হয়। যদি স্বাস্থ্যে বিদ্যমান বর্ণভিত্তিক পার্থক্য প্রকৃতিজাত জেনেটিক পার্থক্যের কারণে সৃষ্টি হয়, তাহলে যে সামাজিক নীতি এবং কাঠামো রোগ সৃষ্টি ও বজায় রাখে, তার দায় থেকে মুক্ত থাকে (উইলিয়ামস ও স্টারনথাল ২০১২)। মূলত দাসপ্রথার ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা এবং টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এই মতের উদ্ভব হয়, যা কালক্রমে সমাজে দৃঢ় বিশ্বাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে, সুদীর্ঘ কাল ধরে এই জনগোষ্ঠী সব ক্ষেত্রে যে অসমতা ভোগ করে, তার প্রতিফল হচ্ছে স্বাস্থ্যবৈষম্য। এই ধারার চিন্তকেরা মূলত সামাজিক কারণসমূহকে স্বাস্থ্যবৈষম্য ব্যাখ্যা করার জন্য যথার্থ বলে মনে করেন। প্রথম ধারার বিপরীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে আফ্রিকান আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী ডব্লিউ ই বি ডুবো আফ্রিকান আমেরিকান জনগোষ্ঠীর ওপর প্রথম সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা করে এর ফলাফল *দ্য ফিলাডেলফিয়া নিগ্রো* নামক তাঁর ক্ল্যাসিক বইয়ে (১৮৯৯) বিশ্লেষণ করেন। তাঁর গবেষণাকর্মটি স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারকের ওপর করা প্রারম্ভিক গবেষণার অন্যতম। ডুবো (১৮৯৯) স্বাস্থ্যে বর্ণভিত্তিক অসমতাকে সামাজিক অগ্রগতিতে বর্ণভিত্তিক পার্থক্যের প্রতিফলন হিসেবে দেখিয়েছেন। স্বাস্থ্যবৈষম্যের কারণ বহু উপাদানের সমষ্টি হলেও মূলত তা সামাজিক। শহরের সবচেয়ে নিম্নমানের আবাসিক এলাকায় জরাজীর্ণ বাসস্থান, নিম্নমানের খাদ্য ও বসবাসের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ স্বাস্থ্যবৈষম্য এবং তাদের অকালমৃত্যুর উচ্চ হারের অন্যতম প্রধান কারণ (ডুবো ১৮৯৯)।

মূলত ডুবোর ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করেই পরে স্বাস্থ্যে বর্ণভিত্তিক বৈষম্যবিষয়ক অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁকে অনুসরণ করে সমাজতাত্ত্বিক ও জনস্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষকেরা দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক কাঠামো এবং

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ভূমিকাকে স্বাস্থ্যের মূল নির্ধারক হিসেবে গণ্য করছেন (ব্রেভম্যান ও অন্যান্য ২০১০; ব্রেভম্যান ও গটলিব ২০১৪; উইলিয়ামস ও কলিন্স ১৯৯৫)। এই উদ্দেশ্য থেকে জনগোষ্ঠীর জৈবিক পার্থক্যের ভিত্তিতে বর্ণবিন্যাসের প্রারম্ভিক ব্যাখ্যার বিপরীতে 'বর্ণ'কে সামাজিক বিভাজন হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (কুপার ও অন্যান্য ২০০৩)। বর্ণভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস প্রকৃতপক্ষে আরোপিত সামাজিক স্তরবিন্যাস; মূলত ক্ষমতা ও আদর্শের ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়ে বিবর্তিত হয় (ব্লনার ১৯৭২)।

আর সামাজিক কাঠামো হচ্ছে সামাজিক জীবনের আদর্শের স্থায়ী রূপ, যা ব্যক্তির মনোভাব ও বিশ্বাস, ব্যক্তির আচরণ ও কাজকর্মের ধরন, বস্তুগত এবং মনস্তাত্ত্বিক সহায় সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করে (উইলিয়ামস ও স্টারনথাল ২০১২)। সমাজকাঠামোর মধ্যে সামাজিক শ্রেণি আর্থসামাজিক অবস্থা হিসেবে সাধারণত ক্রিয়াশীল থাকে, তাই স্বাস্থ্যে বর্ণভিত্তিক বৈষম্য নির্ণয়ে আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক গবেষণা অব্যাহতভাবে প্রমাণ দেখায় যে আর্থসামাজিক অবস্থায় পার্থক্য থাকলে তা স্বাস্থ্যে বর্ণ এবং জাতিভিত্তিক পার্থক্য সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী (উইলিয়ামস ও কলিন্স ১৯৯৫; ব্রেভম্যান ও গটলিব ২০১৪)। সামাজিক অর্থনৈতিক উপাদান যেমন কর্মসংস্থান, আয়, সম্পদ এবং শিক্ষা স্বাস্থ্যের মৌল নির্ধারক। এই সব উপাদান গভীরভাবে ব্যক্তির স্বাস্থ্যসম্পর্কিত আচরণকে প্রভাবিত করে (ব্রেভম্যান ও গটলিব ২০১৪)। হেওয়ার্ড ও অন্যান্য (২০০০) সামাজিক অবস্থা আফ্রিকান আমেরিকান এবং শ্বেতাঙ্গদের স্বাস্থ্যে কীভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করে, তা পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিগত আচরণ নয়, বরং ব্যক্তির আর্থসামাজিক অবস্থা স্বাস্থ্যের বর্ণভিত্তিক স্তরায়নের প্রধান উৎস। উইলিয়ামস ও কলিন্স (১৯৯৫) আর্থসামাজিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্যবৈষম্যের ওপর সমসাময়িক গবেষণা ও বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করে দেখান যে আর্থসামাজিক অবস্থা উচ্চ মানের সেবা, চাপ, ধকল, সামাজিক এবং প্রাকৃতিক দূষণ, সামাজিক সুরক্ষা ও সমর্থন, স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, তাই স্বাস্থ্য পরিস্থিতিতে পার্থক্য সৃষ্টিকারী শক্তিশালী নির্ধারকের মধ্যে আর্থসামাজিক অবস্থা অন্যতম।

তবে সব বর্ণের ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক অবস্থার পরিমাপ সমভাবে প্রয়োগ করে স্বাস্থ্যবৈষম্যের কারণ নির্ণয় কঠিন। শ্বেতকায়দের তুলনায় কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী আফ্রিকান আমেরিকানরা অধিক হারে বেকার, কর্মরত আফ্রিকান আমেরিকানরা অনেক বেশি হারে পেশাগত বিপদ এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলা করে, এমনকি চাকরির অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা সমন্বয়ের পরও এই প্রবণতা দেখা যায় (উইলিয়ামস ও মোহাম্মেদ ২০০৯)। যুগান্তকারী সরকারি গবেষণা রিপোর্ট 'আনইকুয়াল ট্রিটমেন্ট' (২০০৩) প্রকাশ করে যে যখন আফ্রিকান আমেরিকানের

আয় এবং স্বাস্থ্যবিমা শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির মতো একই থাকে, তখনো তারা প্রায়ই দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতার জন্য অপর্যাপ্ত এবং নিম্নমানের চিকিৎসাসেবা পায়। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় উপাত্ত নির্দেশ করে যে শিক্ষাগত যোগ্যতানুযায়ী ২০ বছর এবং তার অধিক বয়সী সব বর্ণের মাতৃ এবং নবজাতকের মৃত্যুর হার বিন্যস্ত করা হলে দেখা যায়, উচ্চশিক্ষিত আফ্রিকান আমেরিকান নারীদের এবং নবজাতকের মৃত্যুর হার হাইস্কুল পাস করেনি এ রকম শ্বেতকায় ও অন্যান্য বর্ণের নারীদের চেয়ে অনেক বেশি (সিডিসি(গ); সিডিসি(ঘ) ২০২০)। দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকিসংক্রান্ত নির্দেশকের ওপর জাতীয় উপাত্ত প্রমাণ করে যে আয়, শিক্ষা, লিঙ্গ এবং বয়স সমন্বয়ের পরও দেখা যায় আফ্রিকান আমেরিকানরা যেকোনো দীর্ঘমেয়াদি রোগে সবচেয়ে বেশি উচ্চ ঝুঁকিতে থাকে (উইলিয়ামস ও মোহাম্মেদ ২০০৯)। এমনকি স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ যেমন ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর নিম্নমানের খাদ্য, শরীরচর্চা এবং স্বাস্থ্যসেবা লভ্যতা ইত্যাদি সামঞ্জস্য বিধানের পরেও আফ্রিকান আমেরিকানদের দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতার উচ্চ ঝুঁকির প্রবণতা দেখা যায়। স্বাস্থ্যে বর্ণভিত্তিক পার্থক্য আফ্রিকান আমেরিকানদের আর্থসামাজিক অবস্থার উচ্চ-নিম্ন প্রতিটি স্তরে লক্ষণীয় মাত্রায় বিদ্যমান (উইলিয়ামস ও মোহাম্মেদ ২০০৯)।

এসব ফলাফল থেকে এই প্রবণতা বোঝা যায় যে বর্ণভিত্তিক অবস্থানের (রেসিয়াল স্ট্যাটাস) সঙ্গে যুক্ত উপাদান আফ্রিকান আমেরিকানদের স্বাস্থ্যকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। উইলিয়ামস ও মোহাম্মেদ (২০০৯) ২০০৫ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত পাবমেড প্রকাশিত স্বাস্থ্যবৈষম্যের ওপর সব গবেষণাকর্ম পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে বর্ণবৈষম্যের সঙ্গে তাদের নিম্নমানের স্বাস্থ্যসুবিধা এবং ফলাফলের গভীর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। সমাজে আর্থসামাজিক অবস্থার কারণে বৈষম্য হলেও বর্ণের ভিত্তিতে যে বৈষম্য হয়, তা সুদীর্ঘ কাল টিকে থাকে, ফলে স্বাস্থ্যেও তা দৃশ্যমান হয়। তাই উইলিয়ামস ও রকার (২০০০) মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে ক্ষমতা এবং কাঙ্ক্ষিত সহায়তা ও সম্পদ প্রাপ্তির অসম সুযোগের ক্ষেত্রে বর্ণ একটি সামাজিক বিভাজক হিসেবে কার্যকর ছিল এবং আছে। এ দেশের সমগ্র ইতিহাসে আফ্রিকান আমেরিকান জনগোষ্ঠী হয় আইন অথবা প্রথা ও প্রচলিত বিশ্বাসের কারণে সব প্রধান সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নিম্নমানের সেবা ও আচরণ পেয়ে থাকে। স্বাস্থ্যসেবাও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবায় বর্ণভিত্তিক বৈষম্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানে যে বর্ণ অসমতা রয়েছে, তার প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে।

বর্ণবাদ একটি সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা, যার শিকড় অধস্তনতার আদর্শে দৃঢ়মূল থাকে। এই আদর্শের ওপর ভিত্তি করে জনগণের স্তরায়ন করে সামাজিক স্থান নির্ধারণ হয় এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সহায়তা, সমর্থন ও সম্পদ বৈষম্যমূলকভাবে বণ্টিত হয় (বনিয়া-সিলভা ১৯৯৬) বর্ণবাদ অন্যান্য বর্ণের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব ও

বিশ্বাস এবং ব্যক্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা অন্যান্য বর্ণের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণের বিকাশ ঘটায় (উইলিয়ামস ও মোহাম্মেদ ২০০৯)। সাংস্কৃতিক বর্ণবাদ এ ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়, যা অধস্তনতার আদর্শকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করে। এই অধস্তনতার আদর্শ কোনো বর্ণভিত্তিক গোষ্ঠীকে অন্যদের চেয়ে সহজাতভাবে এবং সাংস্কৃতিকভাবে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেয়। সাংস্কৃতিক বর্ণবাদ এই আদর্শকে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক বিশ্বাসকে সমর্থন করে (জোন্স ১৯৯৭)। যেহেতু বর্ণবাদ সমাজের সংস্কৃতি এবং প্রতিষ্ঠানে গভীরভাবে প্রোথিত থাকে, তাই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং পলিসিতে বৈষম্য টিকে থাকতে পারে (বেইলি ও অন্যান্য ২০১৭)। ব্যক্তিপর্যায়ে যেমন প্রকাশ্য এবং উদ্দেশ্যমূলক আচরণ তেমনি অনিচ্ছাকৃত, অসচেতন আচরণের মাধ্যমে বৈষম্যের প্রকাশ ঘটে। এমনকি সমাজে বর্ণভিত্তিক মনোভাব ও বৈষম্য লক্ষণীয়ভাবে কমলেও এই প্রবণতা টিকে থাকতে পারে। সংস্কৃতির মূল ধারায় গভীরভাবে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে থাকা বর্ণভিত্তিক বাঁধাধরা ধারণা ও বিশ্বাস এই ধরনের বৈষম্যমূলক ব্যবহারের উৎস হিসেবে কাজ করে (উইলিয়ামস ও মোহাম্মেদ ২০০৯)। কাঠামোগত বৈষম্য যেমন প্রাতিষ্ঠানিক নীতি দ্বারা কার্যকর হয়, তেমনি বাঁধাধরা ধারণার ওপর ভিত্তি করে অসচেতন পক্ষপাত দ্বারাও সমর্থিত হয়। যাদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয়, তারা এ বিষয়ে সচেতন থাকে এবং প্রতিনিয়ত অন্যায্য আচরণ যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে, তা বিভিন্নভাবে শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছে (উইলিয়ামস ও মোহাম্মেদ ২০০৯)। স্বাস্থ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের কারণ নির্ণয়ে তাই সমসাময়িক কালে জনস্বাস্থ্য এবং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় অবচেতন ও অনুভূত বর্ণবাদ যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে।

এভাবে কালের পরিক্রমায় চরম বর্ণবাদের অবসান হলেও সমাজে বৈষম্য এবং অসমতার বহুবিধ দিক লক্ষণীয়ভাবে বজায় থাকতে পারে, তাই বর্ণভিত্তিক স্বাস্থ্যবৈষম্য কেবল স্বাস্থ্যের আর্থসামাজিক নির্ধারক দ্বারা ব্যাখ্যা করা কঠিন। নিম্ন আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিকূলতা যেমন স্বাস্থ্য-অসমতায় অবদান রাখে, সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক এবং চলমান আন্তসম্পর্ক যুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলোর ক্রিয়া, প্রচলিত বর্ণভিত্তিক ধারণা এবং বিশ্বাসও অসমতার জন্য দায়ী। এই বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্যবৈষম্য ও অসমতার মূলগত কারণ প্রধানত দুটি, প্রথমত ঐতিহাসিক অন্যায্য কাঠামো, নীতি এবং ধারণা ও বিশ্বাসের চলমান পারস্পরিক ক্রিয়া, যা মানুষের জীবনে নানা অসমতা তৈরি করে। সরকারি নীতি, আইন, শাসন এবং সংস্কৃতি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত প্রক্রিয়া বর্ণ, লিঙ্গ, শ্রেণিভেদে ক্ষমতা ও সম্পদ অসমভাবে বণ্টন করে (কমিউনিটিস ইন অ্যাকশন ২০১৭)। ফলে সমাজের এক গোষ্ঠীর চেয়ে অন্য গোষ্ঠী অনগ্রসর এবং সুবিধাবঞ্চিত অবস্থায় থাকে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারক, যে অবস্থায় ও পরিবেশে মানুষ বাস করে, শিক্ষা লাভ এবং কাজ করে, পরিণত হয় তা ব্যাপকভাবে মানুষের স্বাস্থ্য, কর্মক্ষমতা, জীবনের মান এবং স্বাস্থ্যঝুঁকিসহ সব কিছু প্রভাবিত এবং নির্ধারণ করে। অসম সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত অবস্থায় ক্ষমতা ও পরিষেবায় অন্তর্ভুক্ত সহায়তা, সম্পদ, সেবা এবং সামাজিক মনোযোগ ও গুরুত্ব অসমভাবে বণ্টিত হয় (কমিউনিটিস ইন অ্যাকশন ২০১৭; বেইলি ও অন্যান্য ২০১৭)। সরকারি নীতি এবং তার চর্চায় প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত পক্ষপাতের পরিণাম হচ্ছে মানুষকে মূলত বর্ণ এবং আর্থসামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে সুবিধাভোগী এবং সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় পৃথক রাখা। বর্ণ এবং শ্রেণিবিভক্ত সুযোগসুবিধা স্বাস্থ্য অসমতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ (কমিউনিটিস ইন অ্যাকশন ২০১৭)।

তাহলে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সরকারি নীতি, সংস্কৃতি, প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাস ইত্যাদি বর্ণের ভিত্তিতে জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিকূল সামাজিক প্রতিবেশ অর্থাৎ স্বাস্থ্যের অসম সামাজিক নির্ধারক সৃষ্টি করে, যা থেকে স্বাস্থ্যবৈষম্য হয়। এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য লক্ষ রেখে প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত প্রক্রিয়া এবং সামাজিক নির্ধারকের ওপর এর প্রভাব বিবেচনা করে স্বাস্থ্যবৈষম্য এবং আফ্রিকান আমেরিকানদের ওপর অতিমারির অসমানুপাতিক পরিণাম বিশ্লেষণ করা হবে। এই লক্ষ্যে প্রথমত ঐতিহাসিক কাঠামোগত প্রক্রিয়া—বর্ণের ভিত্তিতে আবাসিক এলাকার পৃথক্‌করণ এবং আফ্রিকান আমেরিকান জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যে এর সুদূরপ্রসারী পরিণাম এবং দ্বিতীয়ত কীভাবে এই প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যের সামাজিক মানদণ্ডে অসমতা সৃষ্টি করে স্বাস্থ্যবৈষম্য বজায় রাখে, তা পর্যবেক্ষণ করা হবে। এই লক্ষ্যে যে বিভিন্ন উপাদান ব্যক্তির বসবাসের অবস্থা ও পরিবেশ এবং জীবন ও স্বাস্থ্যের মান নির্ধারণ করে, তার মধ্যে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, আয়, সম্পদ, বাসস্থান ও আবাসিক এলাকার মান এবং স্বাস্থ্য সেবাব্যবস্থার সহজলভ্যতা ইত্যাদি মানদণ্ডের ওপর এই নিবন্ধের বিশ্লেষণে নজর দেওয়া হবে।

আবাসিক এলাকার বর্ণভিত্তিক পৃথক্‌করণ

আবাসিক এলাকার বর্ণভিত্তিক পৃথক্‌করণকে স্বাস্থ্যবৈষম্যের একটি প্রধান কারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদের এক স্থায়ী উত্তরাধিকার বলে মনে করা হয় (উইলিয়ামস ও কলিন্স ২০০১; ম্যাসি ও ডেনটন ১৯৯৩)। দাসপ্রথার শুরু থেকেই কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের শ্বেতাঙ্গদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখার ব্যবস্থা এই প্রথা অবসানের পরও অব্যাহত থাকে। বিভিন্ন রাজ্যের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ও জোনিং আইনের মাধ্যমে আইনানুগভাবে আবাসিক এলাকার পৃথক্‌করণ এবং বর্ণভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা চুক্তির মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে বাড়ি বা সম্পত্তি বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা হয়। সুপ্রিম কোর্ট ১৯১৯ ও ১৯৪৭ সালে এই সব আইন রদ করলেও সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণভিত্তিক

পৃথক্করণের চর্চা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং অকার্যকর করা কঠিন হয়।

সুদীর্ঘ কাল স্থানীয় আইন দ্বারা পৃথক্করণ চালু থাকলেও ১৯৩৩ সালে এ বিষয়ে ফেডারেল সরকারের সরাসরি সম্পৃক্ততা দেখা যায়। সে সময়ের অর্থনৈতিক মহামন্দার পর আবাসন বাজার পুনরুদ্ধার এবং আবাসনসংকট নিরসনের জন্য নিউ ডিলের অংশ হিসেবে ফেডারেল আবাসন কর্মসূচি গৃহীত হয়। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আইনগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে গৃহায়ণ এবং আবাসিক এলাকাকে বর্ণের ভিত্তিতে পৃথক্করণের পাকা ব্যবস্থা করা হয় (রথস্টাইন ২০১৭) সরকারের প্রচেষ্টা ছিল শ্বেতাঙ্গ মধ্য এবং নিম্নবিত্তদের জন্য শহরতলিতে মানসম্মত আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা, কৃষ্ণাঙ্গদের এই পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বাইরে রাখা হয়।

আবাসন ব্যবসাকে উৎসাহিত করার জন্য ফেডারেল আবাসন প্রশাসন গঠিত হয়, সেই সঙ্গে বাড়ি ক্রয়ে বন্ধকি ঋণ দান ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, যা এখনো চালু আছে। বন্ধকি ঋণ দানের লক্ষ্যে গঠিত হোম ওনার্স লোন কোয়ালিশন (এইচওএলসি) এবং আবাসন প্রশাসন ২৩৯টি শহরের এলাকাগুলোকে বন্ধক বিনিয়োগের জন্য নিরাপদ ও ঝুঁকি বিবেচনা করে চারটি ভাগে বিভক্ত এবং চারটি রঙে চিহ্নিত করে 'আবাসিক নিরাপত্তা ম্যাপ' তৈরি করে। নীল এলাকা শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত কম ঝুঁকিপূর্ণ, সবুজ এলাকা কুলীন ও পেশাজীবী শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত উত্তম এবং নিরাপদ, হলুদ ছিল সেই সব এলাকা যার সন্নিকটে কৃষ্ণাঙ্গ এলাকা তাই ঝুঁকিপূর্ণ, আর কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত এলাকা কেবল বর্ণ এবং জাতিগত জনবিন্যাসের কারণে বন্ধকি ঋণের জন্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ও অনুপযুক্ত বিবেচনা করে লাল দাগ দেওয়া হয়, যা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে রেডলাইনিং হিসেবে পরিচিত। এই ম্যাপ অনুসরণ করে সবুজ ও নীল এলাকায় গৃহায়ণে ও আবাসিক সুযোগ-সুবিধায় সরকারি বিনিয়োগ হয় এবং বাড়ি ক্রয়ে বন্ধকি ঋণ সহজলভ্য করা হয়। পক্ষান্তরে হলুদ, বিশেষ করে লাল এলাকাকে সরকারি আনুকূল্যের জন্য অনুপযুক্ত বিবেচনা করে বন্ধক ঋণ অস্বীকার করা হয়। বন্ধক ঋণদাতাদের সতর্কতা হিসেবে ম্যাপে কৃষ্ণাঙ্গ-অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে লাল দাগে চিহ্নিত করে আলাদা করার চর্চা কার্যকরভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের ওই সব এলাকায় বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়, যেখানে স্বল্পমাত্রায় বিনিয়োগ হতো (রথস্টাইন ২০১৭)। নির্দিষ্ট এলাকায় বর্ণের ভিত্তিতে পৃথকভাবে বাস করতে বাধ্য করাটা বর্ণবাদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যার উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণাঙ্গদের সামাজিক সংস্রব থেকে শ্বেতাঙ্গদের রক্ষা করা (উইলিয়ামস ও কলিন্স ২০০১)।

ফেডারেল আবাসন প্রশাসন সরকারি অর্থায়নে গড়ে তোলা বন্ধকি ঋণের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ঋণদান ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে, ফলে মার্কিন শহরগুলোতে আবাসিক এলাকার পৃথক্করণের অন্যায্য চর্চা বিস্তৃত হয়। কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে বাড়ি বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞার শর্তে সমগ্র শহরতলিতে শ্বেতাঙ্গদের জন্য আবাসন নির্মাণে

নির্মাণকারীদের ব্যাপকভাবে ভর্তুকি দেওয়া হয় (রথস্টাইন ২০১৭)। কৃষ্ণাঙ্গদের বাইরে রাখার যুক্তি ছিল বিমা করা শ্বেতাঙ্গ মালিকানার বাড়ির মূল্যপতন রোধ করা এবং প্রদত্ত ঋণ নিরাপদ রাখা। ১৯৬৮ সালে ফেয়ার হাউসিং অ্যাক্ট আবাসনে বর্ণভিত্তিক বৈষম্যকরণ নিষিদ্ধ করলেও এই আইনের কার্যকারিতা সীমিত ছিল। রেডলাইনিং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে, এমনকি যেসব রাজ্যে কঠোর জিম ক্রো পৃথক্‌করণ আইনের কার্যকারিতা ছিল না, সেখনেও বহুলভাবে চর্চিত হতো। ফলে এই বৈষম্যমূলক নীতির চর্চা যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোর পৃথক্‌কৃত কাঠামোকে আরও শক্তিশালী ও স্থায়ী রূপ দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক শহরে এখনো অর্থনৈতিক ও বর্ণভিত্তিক আবাসিক পৃথক্‌করণের ধরন সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান (জেন ২০১৮)।

মিচেল ও ফ্র্যানকো (২০১৮) এইচওএলসি ম্যাপের সঙ্গে আজকের আদমশুমারির উপাত্ত তুলনা করে দেখিয়েছেন, আট দশক পরেও এসব এলাকার বর্ণ ও জাতিগত কাঠামো এবং অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা একই আছে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লাল চিহ্নিত আবাসিক এলাকা এখনো প্রধানত দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের আফ্রিকান আমেরিকান এবং হিস্পানিকদের আবাস, সামাজিক, অর্থনৈতিকভাবে তারা সুবিধাবঞ্চিত, তাদের পারিবারিক আয় এবং সম্পত্তির মূল্য নিম্নমানের। যেসব এলাকা ১৯৩০ দশকে ‘উত্তম’ শ্রেণিভুক্ত ছিল, সেসব এলাকা বর্তমানে মধ্য এবং উচ্চ আয়ের মানুষ বাস করে, যার ৮৫ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ (মিচেল ও ফ্র্যানকো ২০১৮)। প্রায় সব রাজ্যে এখনো উভয় এলাকার অর্থনৈতিক অসমতা প্রখর। বিশেষ করে মেট্রোপলিটান এলাকাগুলোতে পৃথক্‌করণ আজও নিশ্চল এবং অপরিবর্তনীয় অর্থনৈতিক অসমতা বজায় রেখেছে। কারণ, বিচ্ছিন্ন, পৃথক্‌কৃত এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত মানুষ অবস্থার উন্নয়নে কম সমর্থ হয় (রথস্টাইন ২০১৭; মিচেল ও ফ্র্যানকো ২০১৮; উইলিয়ামস ও কলিন্স ২০০১)। রেডলাইনিংয়ের প্রলম্বিত প্রভাব সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায়, কীভাবে আবাসিক এলাকার পৃথক্‌করণ দারিদ্র্যের কেন্দ্রীভবন, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়েছে এবং আবাসিক পরিবেশে রোগের উর্বর ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে (উইলিয়ামস ও কলিন্স ২০০১; ম্যাসি ২০০৪; ম্যাসি ও ডেনটন ১৯৯৩)। যেকোনো এলাকায় বাস করার অধিকার, সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন এলাকায় সন্তান লালনপালন এবং মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ ও অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে মূলত সরকারি নীতির মাধ্যমে।

তা ছাড়া ১৯৩০ দশকে বন্ধকি ঋণে বর্ণভিত্তিক বৈষম্য চর্চা আজকের মার্কিন জনগোষ্ঠীর সম্পদের মালিকানার ধরনের রূপ দিয়েছে (মিচেল ও ফ্র্যানকো ২০১৮)। যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকান ড্রিমের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বাড়ির মালিকানা, যা সাফল্য, সুযোগ এবং সম্পদের প্রতীক। অধিকাংশ মার্কিন মধ্যবিত্ত পরিবার বাড়ি থেকে পাওয়া ইক্যুইটি থেকে সম্পদ গড়ে। রেডলাইনিংয়ের ফলে আফ্রিকান আমেরিকান-অধ্যুষিত

এলাকায় সম্পত্তির নিম্ন মূল্য, বাড়ি ক্রয়ে বন্ধকি ঋণের অভাব প্রজন্ম ধরে আফ্রিকান আমেরিকানদের বাড়ির মালিকানা থেকে আর্থিক সুবিধা লাভে বঞ্চিত করেছে। পরিণামে যুক্তরাষ্ট্রে সম্পদের মালিকানায় স্থায়ী বর্ণভিত্তিক ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে (পেরি ও অন্যান্য ২০১৮; মিচেল ও ফ্র্যানকো ২০১৮)। শ্বেতাঙ্গ পরিবার আফ্রিকান আমেরিকান পরিবারের চেয়ে প্রায় দশ গুণ এবং হিস্পানিক পরিবারের চেয়ে আট গুণ বেশি মোট সম্পদের অধিকারী (জেন ২০১৮)। সম্পদের এই ব্যাপক ব্যবধান ফেডারেল আবাসন পলিসির সুদূরপ্রসারী প্রভাব বলে মনে করা হয়।

আবাসিক এলাকার পৃথক্করণ স্বাস্থ্যে বর্ণভিত্তিক বৈষম্যের মৌলিক কারণ (উইলিয়ামস ও কলিন্স ২০০১; ম্যাসি ২০০৪; ম্যাসি ও ডেনটন ১৯৯৩)। পৃথক্করণ শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার লভ্যতা নির্ধারণ করে আর্থসামাজিক অবস্থায় বর্ণভিত্তিক পার্থক্য তৈরি করে, যা কার্যত স্বাস্থ্যবৈষম্যে অবদান রাখে। এসব এলাকায় প্রায়ই মৌলিক সেবা যেমন মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান ও পর্যাপ্ত গণপরিবহনের অভাব স্বাস্থ্যের সামাজিক মানদণ্ডে অসমতা সৃষ্টি করে স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে। আবাসিক পৃথক্করণ সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে বলে আফ্রিকান আমেরিকানরা দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা এবং অকালমৃত্যুর উচ্চ ঝুঁকিতে থাকে (উইলিয়ামস ও কলিন্স ২০০১; গ্যাসকিন ২০১২)। অতিমারিকালীন সম্পাদিত এক গবেষণা রিপোর্ট (এনসিআরসি ২০২০) ১৪২টি শহরের সাবেক লাল চিহ্নিত এলাকার অধিবাসীদের বর্তমান অর্থনৈতিক এবং স্বাস্থ্য অবস্থা ও ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে এসব এলাকায় দারিদ্র্যের উচ্চ হার, নিম্ন গড় আয়ু এবং নানা ধরনের দীর্ঘমেয়াদি রোগের আধিক্য নির্দেশ করে। গবেষকেরা এসব এলাকায় বসবাসকারী আফ্রিকান আমেরিকানদের ওপর অতিমারির কঠোর অভিঘাত এবং কোভিড-১৯ জনিত গুরুতর অসুস্থতা ও মৃত্যুঝুঁকি বৃদ্ধির সব উপাদানের ব্যাপক উপস্থিতি দেখেছেন।

শিক্ষা

শিক্ষাগত অর্জন ইতিবাচকভাবে স্বাস্থ্য অবস্থার নির্দেশক। গোল্ডম্যান ও স্মিথ (২০১১) যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাগত অর্জনের সঙ্গে স্বাস্থ্য ফলাফলের সুস্পষ্ট সম্পর্ক দেখিয়েছেন। শিক্ষা স্বাস্থ্য জ্ঞান বৃদ্ধি করে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত আচরণকে প্রভাবিত করে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধার দ্যোতনা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সংযোগকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্তির জন্য অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্যবিমা অধিকাংশ মার্কিন নাগরিক কর্মসূত্রে লাভ করেন। বিগত পাঁচ দশকে আফ্রিকান আমেরিকানদের শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জন বেড়েছে, তবে বর্ণ ব্যবধান নিরসনে কম অগ্রগতি হয়েছে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষায় (জোন্স ও অন্যান্য ২০১৮)। ২০১৭ সালের আদমশুমারি ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ২৫ এবং তার

ঊর্ধ্ব বয়সী ৯২.৯ শতাংশ শ্বেতাঙ্গের বিপরীতে ৮৬.০ শতাংশ আফ্রিকান আমেরিকান হাইস্কুল পাস করেছে, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছে ২১.৪ শতাংশ আফ্রিকান আমেরিকান, ৩৫.৮ শতাংশ শ্বেতাঙ্গর বিপরীতে (ওএমএইচ)।

নাগরিক অধিকার আন্দোলনের পর এ পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় পৃথক্‌কৃত আফ্রিকান আমেরিকান প্রধান এলাকায় মানসম্মত প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়ের অভাব প্রকট। সুপ্রিম কোর্ট ৬৫ বছর আগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বর্ণভিত্তিক পৃথক্‌করণ নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও আফ্রিকান আমেরিকান ছেলেমেয়েরা এখনো উচ্চমাত্রায় পৃথক্‌কৃত ও অপর্যাপ্ত তহবিলে পরিচালিত বিদ্যালয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ১০০টি বড় শহরের প্রায় অর্ধেক শহরে অধিকাংশ আফ্রিকান আমেরিকান ও হিস্পানিক ছাত্রছাত্রী যেসব বিদ্যালয়ে যায়, তার কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ফেডারেল গাইডলাইনস অনুযায়ী দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পরিবারের (বস্কমা ২০১৬)। অপর এক সরকারি সমীক্ষায় (জিএও ২০১৬) দেখা গেছে, এসব বিদ্যালয় বর্ণ ও অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে কেন্দ্রীভূত, ৭৫ থেকে ১০০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী দরিদ্র আফ্রিকান আমেরিকান ও হিস্পানিক। পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবে অন্যান্য বিদ্যালয়ের তুলনায় এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিম্ন, শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত স্কুলের চেয়ে ছাত্রপ্রতি গড় ব্যয় অনেক কম। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যালয়ের তহবিলের বড় অংশ সাধারণত স্থানীয় সম্পত্তি কর থেকে আসে, আফ্রিকান আমেরিকানপ্রধান এলাকায় সম্পত্তির নিম্ন মূল্যের কারণে স্থানীয় উৎস থেকে বিদ্যালয়ে অর্থায়ন কম হয় বলে মানসম্মত শিক্ষা ব্যাহত হয়।

কর্মসংস্থান

বিগত দশকগুলোতে শিক্ষার হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকান আমেরিকানদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলেও ঐতিহাসিকভাবে তাদের বেকারত্বের হার (৯.৫%) শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে (৪.২ শতাংশ) দ্বিগুণ (ওএমএইচ)। ২০১৯ সালে যখন বেকারত্বের জাতীয় হার মাত্র ৩.৭ শতাংশ ছিল এবং শ্বেতাঙ্গ বেকারত্বের হার ছিল ৩.০ শতাংশ, তখনো এই হার আফ্রিকান আমেরিকানদের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ ছিল, ৬.১ শতাংশ (গোল্ড ও উইলসন ২০২০)। ইকোনমিক পলিসি ইনস্টিটিউটের (ইপিআই ২০২০) উপাত্তে দেখা যায়, অতিমারি চলাকালে সব প্রধান জনগোষ্ঠীর মধ্যে আফ্রিকান আমেরিকানদের বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি। সেপ্টেম্বর মাসে (২০২০) বেকারত্বের জাতীয় হার যখন ৭.২ শতাংশ ছিল, এই হার আফ্রিকান আমেরিকানদের ১০.৩, হিস্পানিকদের ৯.২ এবং শ্বেতাঙ্গদের ৫.৯ শতাংশ ছিল। তবে গবেষক গোল্ড ও উইলসন (২০২০) দেখিয়েছেন যে শিক্ষাগত অর্জন দিয়ে আফ্রিকান আমেরিকানদের বেকারত্বের হারে এই বর্ণভিত্তিক পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যায় না। শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রতিটি মান অনুযায়ী শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে আফ্রিকান আমেরিকানদের বেকারত্বের হার লক্ষণীয়ভাবে অনেক

বেশি, এমনকি যাঁদের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি আছে, তাঁদের ক্ষেত্রেও একই ব্যবধান দৃশ্যমান।

অপর দিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকান আমেরিকান বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিম্ন বেতনের কাজে নিয়োজিত (ব্রুকিংস ২০১৯)। অতিমারি চলাকালে যেসব কাজকে সম্মুখসারির বা জরুরি সেবা হিসেবে অভিহিত করা হয়। তারা মূলত ওষুধ, খাদ্য, ভোগ্যপণ্যের দোকান, গণপরিবহন, পোস্টাল সার্ভিস, গৃহস্বাস্থ্য এবং সামাজিক সেবা ইত্যাদি কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত (গোল্ড ও উইলসন ২০২০)। এই ধরনের কাজ অস্থিতিশীল হওয়ায় চাকরির অনিশ্চয়তা বেশি এবং কর্মসূত্রে পাওয়া কল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধারও ঘাটতি থাকে। কর্মসূত্রে পাওয়া স্বাস্থ্যবিমা ছাড়াও আরও দুটি সুবিধা বিশেষ করে অতিমারির সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেতনসহ অসুস্থতাজনিত ছুটি এবং ঘরে থেকে কাজ করার সুযোগ। এই দুটি সুবিধা একদিকে নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষা দেয়, আবার অর্থনৈতিক নিরাপত্তাও বজায় রাখে। প্রাক্-অতিমারি থেকেই দুটোর একটি সুবিধাও তাদের কাজের ধরনের কারণে অধিকাংশ আফ্রিকান আমেরিকান পায় না। ঘরের সুরক্ষিত পরিবেশে কাজ করার অনুমোদন দেয় এই ধরনের পেশায় আফ্রিকান আমেরিকানদের সংখ্যা কম। চাকরি রক্ষা এবং নিরাপদ থাকার অসমর্থতার কারণে অতিমারির সময়ে আর্থিক এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বজায় রাখা তাদের পক্ষে কঠিন হয় (গোল্ড ও উইলসন ২০২০)। অতিমারির প্রারম্ভে করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের প্রধান কেন্দ্র নিউইয়র্ক সিটি এবং অন্যান্য বড় শহরে আফ্রিকান আমেরিকানদের অসমানুপাতিক হারে সংক্রমণ এবং মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জরুরি এবং সম্মুখসারির কর্মীদের মধ্যে তাদের সংখ্যাধিক্য (সিডিসি(ঘ) ২০২০)।

ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক আয়ে অসমতা

স্বাস্থ্যসেবা লাভে পরিবারের সক্ষমতার ক্ষেত্রে আয় একটি প্রধান নির্ধারক। যুক্তরাষ্ট্রে পর্যাপ্ত আয় মানুষকে স্বাস্থ্যবিমা পেতে সমর্থ করে, স্বাস্থ্যকর জীবন এবং স্বাস্থ্যের অন্যতম সামাজিক নির্ধারক এলাকাভিত্তিক সুবিধা সহজলভ্য করে। মানুষ স্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ আবাসিক এলাকায় বসবাসে সক্ষম হয় (কমিউনিটিস ইন অ্যাকশন ২০১৭)। আফ্রিকান আমেরিকানদের ক্ষেত্রে এই বাস্তবতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে সব প্রধান জনগোষ্ঠীর মধ্যে আফ্রিকান আমেরিকানদের মধ্যে দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে বেশি। তাদের ২২.৯ শতাংশ দারিদ্র্যসীমায় বাস করে, শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে এই হার ৯.৬ শতাংশ (ওএমএইচ)। জনগণের আয়সংক্রান্ত পরিসংখ্যান স্পষ্ট নির্দেশ করে আফ্রিকান আমেরিকানদের পারিবারিক গড় আয় (পরিবারের সদস্যদের মিলিত আয়) সবচেয়ে কম, ২০১৭ সালের আদমশুমারির

উপাত্ত অনুযায়ী এই সংখ্যা বার্ষিক ৪০,১৬৫ ডলার। অন্যদিকে হিস্পানিকদের ৪৯,৭৯৩ ডলার, শ্বেতাঙ্গদের ৬৫,৮৪৫ ডলার এবং এশিয়ানদের ৮৩,৪৫৬ ডলার (ওএমএইচ)। ২০১৮ সালে আফ্রিকান আমেরিকানদের বছরে গড় পারিবারিক আয় ছিল ৪১,৩৬১ ডলার, পক্ষান্তরে শ্বেতাঙ্গ পরিবারের গড় আয় ছিল ৭০,৬৪২ ডলার (সেন্সাস ব্যুরো (খ) ২০১৯)

পারিবারিক আয়ে এই ব্যবধানের কারণ অনেকটা শ্রমবাজারে বিদ্যমান মজুরিবৈষম্যের মধ্যে নিহিত বলে মনে করা হয়। শ্বেতাঙ্গ শ্রমজীবীদের প্রাপ্ত এক ডলারের বিপরীতে আফ্রিকান আমেরিকান পুরুষ মাত্র ০.৭১ সেন্টস এবং নারী ০.৬৪ সেন্টস লাভ করে (গোল্ড ও উইলসন ২০20)। শ্রমবাজারে ঐতিহাসিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় শ্বেতাঙ্গরা ব্যতিক্রমীভাবে উচ্চ মজুরি লাভ করে বলে এই দুই বর্ণের কর্মজীবীদের মধ্যে মজুরিবৈষম্য প্রখর। এই বিষয়ে গোল্ড ও উইলসন (২০২০) তাদের গবেষণা বিশ্লেষণে প্রমাণ করেছেন যে শিক্ষাগত যোগ্যতার মান অনুযায়ী সব চাকরিতে আফ্রিকান আমেরিকান ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বেতনবৈষম্য বিদ্যমান। এমনকি উল্লিখিত নিম্ন বেতনের কাজেও আফ্রিকান আমেরিকান শ্রমজীবীরা একই ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সমপরিমাণ কর্ম অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও মজুরিবৈষম্য ভোগ করে। তবে ন্যূনতম মজুরির (সরকারনির্ধারিত) ক্ষেত্রে অসমতা কিছুটা কম থাকলেও উচ্চ বেতনের চাকরিতে সবচেয়ে বেশি বেতনবৈষম্য রয়েছে। এমনকি উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আফ্রিকান আমেরিকান কর্মজীবীরাও শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বেতনবৈষম্য ভোগ করে (গোল্ড ও উইলসন ২০২০)।

সম্পদবৈষম্য

পারিবারিক মোট পুঞ্জীভূত সম্পদের ক্ষেত্রে বর্ণভিত্তিক পার্থক্য কতটা প্রকট, তা পাওয়া যায় ২০১৬ সালের ফেডারেল রিজার্ভের উপাত্ত থেকে। শ্বেতাঙ্গ পরিবারের গড় মোট সম্পদের মূল্য ১,৭১০০০ ডলার, অপর দিকে আফ্রিকান আমেরিকান পরিবারের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা মাত্র ১৭,৬০০ ডলার (হ্যাঙ্কস ও অন্যান্য ২০১৮)। সম্পদের এই ব্যবধান শিক্ষা, বয়স, আয়নির্বিশেষে বিদ্যমান। এমনকি উচ্চশিক্ষাগত যোগ্যতাও এই ব্যবধান কমাতে পারে না (হ্যাঙ্কস ও অন্যান্য ২০১৮)।

আয় এবং সম্পদের এই ব্যাপক বর্ণভিত্তিক ব্যবধান ফেডারেল আবাসন নীতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব বলে বিশ্লেষকেরা মনে করেন (মিচেল ও ফ্র্যানকো ২০১৮; পেরি ও অন্যান্য ২০১৮)। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে ঐতিহাসিকভাবে বাড়ি ক্রয়ের বন্ধকি ঋণের বাজারে বর্ণভিত্তিক বৈষম্যের কারণে উভয় জনগোষ্ঠীর বাড়ির মালিকানায় বড় ব্যবধান বিদ্যমান। এই ব্যবধান ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দায় আরও প্রখর হয়েছে। ১৯৬৮ সালে ফেয়ার হাউজিং আইন পাস হওয়ার অর্ধ শতক পরেও আফ্রিকান

আমেরিকানদের বাড়ির মালিকানা হার কার্যত অপরিবর্তনশীল (জোন্স ২০১৮)। বাড়ি ক্রয়ে তাদের উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ এবং কঠোর শর্তাবলির বাধ্যবাধকতা থাকে। আফ্রিকান আমেরিকান-অধ্যুষিত এলাকায় সম্পত্তির মূল্য কম থাকায় তারা বাড়ির মালিকানা থেকে সম্পদ গড়তে ব্যর্থ হয়। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ এবং অবসরকালীন সঞ্চয়ও খুব কম থাকে (হ্যাঙ্কস ও অন্যান্য ২০১৮)। সম্পদে এই ব্যবধান আফ্রিকান আমেরিকানদের উচ্চশিক্ষা এবং অর্থনৈতিক গতিশীলতার সুযোগ সীমিত করে এবং আর্থিকভাবে অনিরাপদ রাখে। ফলে অতিমারিজনিত আর্থিক দুর্ভোগ মোকাবিলায় তারা সবচেয়ে কম সমর্থ হয়েছে (এনপিআর, হার্ভার্ড ২০২০)।

বাসস্থান এবং আবাসিক এলাকার গুণগত মান

বাসস্থান এবং আবাসিক এলাকার বৈশিষ্ট্য স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নির্ধারক। যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তির স্বাস্থ্য ফলাফলে আবাসিক এলাকা একটি মৌল বিষয়; কারণ, আবাসিক এলাকার অবস্থান স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারকের রূপ নির্ণয় করে। এলাকাভেদে মৌলিক মানবিক প্রয়োজন যেমন শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক সহায়তা ও পরিষেবা, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান ইত্যাদির মান এবং পরিমাণগত ভিন্নতা হয়। ঐতিহাসিকভাবে আফ্রিকান আমেরিকান-অধ্যুষিত এলাকায় সরকারি বিনিয়োগ, পরিষেবা এবং গৃহায়ণবৈষম্যের কাঠামোগত চর্চার কারণে এসব এলাকার গুণগত মান নিম্ন এবং স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক উপাদানে ভারাক্রান্ত।

সাশ্রয়ী আবাসন বিকল্প এবং বাড়ির মালিকানার অভাবে অধিকাংশ আফ্রিকান আমেরিকান অপরিসর, জরাজীর্ণ আবাস এবং দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনাকীর্ণ আবাসিক এলাকায় বসবাস করে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং সিডিসি (সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল) তাদের বাসস্থান এবং বসবাসের ধরন করোনাভাইরাসে এত উচ্চ হারে সংক্রমণের অন্যতম প্রধান কারণ বলে মনে করে (সিডিসি (ঘ) ২০২০)। আফ্রিকান আমেরিকানপ্রধান আবাসিক এলাকায় কেন্দ্রীভূত দারিদ্র্য সবচেয়ে বেশি, যা স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারকে নানা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। আবাসিক এলাকায় অপরাধপ্রবণতা, সহিংসতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং পরিবেশগত উপাদান তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব রাখে। সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগের অভাব এবং বিনিয়োগ প্রত্যাহারের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকান আমেরিকান-অধ্যুষিত জনপদে যেমন মানসম্মত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার অভাব রয়েছে (গ্যাসকিন ও অন্যান্য ২০১২), তেমনি রয়েছে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের ভাষায় ফুড ডেজার্ট—স্বাস্থ্যকর খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতা (ব্রুকস ২০১৪)। এসব এলাকার অধিবাসীদের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্যকর খাদ্যসামগ্রী, তাজা ফলমূল শাকসবজি সহজলভ্য নয়, যদিও সস্তা মদ হাতের নাগালেই থাকে (গান্ডারসান ও

জিলিআক ২০১৫)। একদিকে স্বাস্থ্যকর খাদ্যসামগ্রী ক্রয়ে আর্থিক সংগতির অভাব, অন্যদিকে সহজলভ্য না হওয়ায় অস্বাস্থ্যকর, সস্তা, উচ্চ ক্যালরিযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রীর ওপর অধিক নির্ভরশীলতা তাদের নানা দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে (গ্যাসকিন ও অন্যান্য ২০১৪)। তবে এ ক্ষেত্রে বর্ণভিত্তিক পার্থক্য নির্দেশ করে গবেষকেরা দেখিয়েছেন, একই রকম দারিদ্র্যের মাত্রা রয়েছে এ রকম শ্বেতাঙ্গ আবাসিক এলাকায় আফ্রিকান আমেরিকান এবং হিস্পানিক প্রধান এলাকার চেয়ে তাজা ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যসামগ্রী অনেক বেশি সহজলভ্য। তাই স্বাস্থ্যকর খাদ্যসামগ্রীর সহজপ্রাপ্যতার ক্ষেত্রে একটি এলাকার দারিদ্র্যের মাত্রার চেয়ে এলাকার বর্ণভিত্তিক জনবিন্যাস অধিক অর্থ বহন করে বলে তাঁরা মনে করেন (ব্রুকস ২০১৪)।

যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকান আমেরিকানসহ অশ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী নানাভাবে পরিবেশগত উপাদান দ্বারা সবচেয়ে বেশি শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় (বারকোভিটস ২০২০)। পরিবেশগত বর্ণবাদ অর্থাৎ অশ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যে পরিবেশগত ঝুঁকির অসমানুপাতিক পরিণাম বর্ণভিত্তিক অসম স্বাস্থ্য ফলাফল সৃষ্টির জন্য বিশেষভাবে দায়ী (গোল্ড ও উইলসন ২০২০)। পরিবেশগত বর্ণবাদ অবিচ্ছেদ্যভাবে আবাসিক এলাকার ঐতিহাসিক বর্ণভিত্তিক পৃথক্‌করণের সঙ্গে যুক্ত। অশ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত এলাকার সস্তা জমিতে দূষণ নির্গমনকারী পাওয়ার প্ল্যান্ট, শিল্পকারখানা ও বিষাক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন করা হয়। এসব স্থাপনার সন্নিহিত এলাকায় বসবাসের কারণে আফ্রিকান আমেরিকান অসমানুপাতিক হারে বায়ুদূষণের শিকার হয়, ফলে তারা প্রতিনিয়ত মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকে (মিকাটি ও অন্যান্য ২০১৮; বারকোভিটস ২০২০)। মিকাটি ও অন্যান্য (২০১৮) তাঁদের বিশ্লেষণে দেখান যে যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী পার্টিকুলেট ম্যাটার (পিএম ২.৫-একটি প্রধান ও বিপজ্জনক বায়ুদূষণ কারক) নির্গমনকারী স্থাপনাগুলো অসমভাবে আফ্রিকান আমেরিকান প্রধান আবাসিক এলাকার সন্নিকটে অবস্থিত এবং সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে তারা সর্বোচ্চ মাত্রায় পিএম ২.৫ দূষণের ভার বহন করে। এই দূষণ নিঃসরণের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুতর রোগ যেমন হৃদ্‌রোগ, হাঁপানি, ফুসফুস সংক্রমণ ও ক্যানসারের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে (বারকোভিটস ২০২০; স্যাস ২০১৩)। এভাবে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় অধিকাংশ আফ্রিকান আমেরিকান দূষিত বায়ু ও পানি এবং খাদ্যনিরাপত্তাহীনতায় ক্রনিক অসুস্থতার উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে বাস করে। মিলেট ও অন্যান্য (২০২০) কোভিড-১৯ আক্রান্ত এবং মৃতদের মধ্যে বর্ণভিত্তিক ব্যবধান চিহ্নিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত এক গবেষণা ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, যেসব আফ্রিকান আমেরিকান-অধ্যুষিত কাউন্টিগুলোতে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার অধিক, সেখানে অধিক হারে নানা ধরনের দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা এবং বায়ুদূষণের উচ্চমাত্রা রয়েছে (মিলেট ও অন্যান্য ২০২০)। প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা এবং আবাসিক এলাকার পৃথক্‌করণের টেকসই ব্যবস্থা এমন এক কাঠামোগত বাধা সৃষ্টি

করে যে তাদের পক্ষে দূষণমুক্ত ও উন্নত স্বাস্থ্যবান্ধব এলাকায় স্থানান্তরিত হওয়া কঠিন (বারকোভিটস ২০২০)।

স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে অসমতা

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যব্যবস্থা সর্বজনীন বা অখণ্ড কোনো ব্যবস্থা নয়। সরকারি ও বেসরকারি, লাভজনক ও অলাভজনক স্বাস্থ্যবিমা কোম্পানি এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের নিয়ে গঠিত একটি মিশ্র ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বেসরকারি খাতের প্রাধান্য বেশি এবং যেকোনো উন্নত ধনী দেশের চেয়ে চিকিৎসাসেবা অত্যন্ত ব্যয়বহুল (পাপানিকোলাস ও অন্যান্য ২০১৮)। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি বা পরিবারের স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় নির্বাহের উপায় হচ্ছে স্বাস্থ্যবিমা। ব্যক্তিকে বিমার জন্য একটি স্বাস্থ্যবিমা কোম্পানিকে অর্থ বা প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হয়, বিনিময়ে বিমার ধরনের ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসা ব্যয়ের অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ দেওয়া হয়। ২০১৮ সালে ৯২ শতাংশ মার্কিন জনগণের স্বাস্থ্যবিমা ছিল। ৮.৫ শতাংশের কোনো ধরনের স্বাস্থ্যবিমা ছিল না (বারচিক ও অন্যান্য ২০১৯)।

বেসরকারি স্বাস্থ্যবিমার মধ্যে প্রধান হচ্ছে চাকরির কল্যাণমূলক সুবিধার অংশ হিসেবে পাওয়া স্বাস্থ্যবিমা, এ ক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি উভয়ে প্রিমিয়াম পরিশোধে অবদান রাখে। মার্কিন জনগণের ৫৫শতাংশ এই বিমার অধিকারী (বারচিক ও অন্যান্য ২০১৯)। অন্য বেসরকারি বিমা হচ্ছে সরাসরি বিমা কোম্পানির কাছ থেকে ক্রয় করা, ১১ শতাংশ জনগণ এই বিমার আওতায় (বারচিক ও অন্যান্য ২০১৯)।

সরকারি বিমা পরিকল্পনা প্রধানত দুটি, মেডিকেয়ার এবং মেডিকেইড। সম্পূর্ণ ফেডারেল সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত মেডিকেয়ার ৬৫ বছর ঊর্ধ্ব এবং ৬৫ বছরের নিচে শারীরিকভাবে অক্ষম জনগণের স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় বহন করে। মেডিকেইড নিম্ন আয়ের ও দরিদ্র পরিবারের স্বাস্থ্যসেবার জন্য রাজ্য পরিচালিত কর্মসূচি। রাজ্য এবং ফেডারেল সরকার যুগ্মভাবে এই ব্যবস্থায় অর্থায়ন করে। এতে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিভিন্ন রাজ্যে আয় ও দারিদ্র্যের ন্যূনতম সীমা নির্ধারণ হয় ভিন্ন ভিন্নভাবে। মার্কিন নাগরিকদের ৩৪.৪ শতাংশ উভয় প্রকার সরকারি বিমার আওতাভুক্ত (বারচিক ও অন্যান্য ২০১৯)।

সরকারি স্বাস্থ্যবিমা ব্যবস্থায় নানা সীমাবদ্ধতা, সাশ্রয়ী বেসরকারি বিমার অভাব এবং পূর্ব অসুস্থতার কারণে বিমা কোম্পানি দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণে দশ বছর আগে লাখ লাখ মার্কিন জনসাধারণ বিমাহীন এবং স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত থাকত। সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য ২০১০ সালে বারাক ওবামা প্রশাসনের উদ্যোগে এফোরডেবল কেয়ার অ্যাক্ট পাস হয়। ওবামাকেয়ার নামে পরিচিত এই

আইনের লক্ষ্য ছিল স্বাস্থ্যবিমা প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে সেবার মান উন্নত ও সাশ্রয়ী করা। ওবামাকেয়ারের আগে সন্তানসহ মা-বাবার মেডিকেইড উপযুক্ততা খুব নিম্ন আয়ের পরিবারের মধ্যে সীমিত ছিল, নির্ভরশীল সন্তান ছাড়া মানুষ যত দরিদ্র হোক, ফেডারেল নীতি অনুযায়ী অন্তর্ভুক্তির অনুপযুক্ত ছিল (কাইসার ২০১৮)। নতুন আইনের অধীনে মেডিকেইড অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতার মানদণ্ড সম্প্রসারণ করার পর বিরাটসংখ্যক মার্কিন নাগরিক স্বাস্থ্যসেবা পরিধির অন্তর্ভুক্ত হয়। যারা মেডিকেইডের আওতাবহির্ভূত থেকে যায়, তাদের স্বাস্থ্যবিমা ক্রয়ের জন্য ট্যাক্স ক্রেডিট বা ভর্তুকি দেওয়া হয়। তা ছাড়া পূর্ব অসুস্থতার জন্য প্রত্যাখ্যানের বিমা কোম্পানির প্রচলিত নিয়মও বাতিল করা হয়।

ওবামাকেয়ার বাস্তবায়নের পর সব জনগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে আফ্রিকান আমেরিকানদের স্বাস্থ্যসেবা পরিধিতে অন্তর্ভুক্তির হার ২০১০ থেকে ২০১৬-এর মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। নতুন আইনের অধীনে যে ২০ মিলিয়ন মানুষ স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আসে, তাদের মধ্যে ২.৮ মিলিয়ন আফ্রিকান আমেরিকান (টেলর ২০১৯)। চৌত্রিশ শতাংশ আফ্রিকান আমেরিকান মেডিকেইড এবং ১০ শতাংশ মেডিকেয়ারে অন্তর্ভুক্ত (আফ্রিকান আমেরিকান ২০২০)। সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকান আমেরিকান কর্মসূত্রে প্রাপ্ত বেসরকারি স্বাস্থ্যবিমা ব্যবহার করে (সেন্সাস ব্যুরো (ক) ২০১৯)।

এই অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনো আফ্রিকান আমেরিকানদের মধ্যে স্বাস্থ্যবিমাহীনের হার অনেক বেশি (সেন্সাস ব্যুরো (ক) ২০১৯)। কারণ, সব রাজ্যে ওবামাকেয়ারের মেডিকেইড সম্প্রসারণ না হওয়ায় তাদের একটি বড় অংশ স্বাস্থ্য অবকাঠামোয় সন্নিবেশিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। মেডিকেইড সম্প্রসারণের বিরোধিতা করে বিভিন্ন রাজ্যের দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মেডিকেইড সম্প্রসারণ রাজ্যের জন্য ঐচ্ছিক করা হয়। ফলে এ পর্যন্ত ১৪টি রাজ্য তাদের মেডিকেইড কর্মসূচি সম্প্রসারণ করেনি (গারফিল্ড ও অন্যান্য ২০১৯)। এসব রাজ্যের অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকান আমেরিকান বাস করে। মেডিকেইড সম্প্রসারণ প্রত্যাখ্যান করায় এই অঞ্চলের রাজ্যগুলোতে বিরাটসংখ্যক আফ্রিকান আমেরিকানসহ অন্যান্য অশ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্যবিমাহীন এবং স্বাস্থ্যসেবাবঞ্চিত অবস্থায় রয়েছে (গারফিল্ড ও অন্যান্য ২০১৯)।

আফ্রিকান আমেরিকান জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিম্ন আয় এবং দারিদ্র্যের হার অধিক হওয়ায় সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বাস্থ্য অবস্থা উন্নত করার জন্য মেডিকেইড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব রাজ্যে মেডিকেইড সম্প্রসারণ না হওয়ায়, স্বাস্থ্যসেবায় সুদীর্ঘ কাল স্থায়ী বর্ণ ও জাতিভিত্তিক বৈষম্য কমিয়ে আনার নতুন আইনের লক্ষ্য সম্পূর্ণ অর্জিত হয়নি। ২০১৮ থেকে স্বাস্থ্যবিমাহীন আফ্রিকান আমেরিকানের সংখ্যা পুনরায় দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকাংশ বিমাহীন আফ্রিকান আমেরিকান নিম্ন আয়ের হওয়ায় বেসরকারি

বিমা কিনতে পারে না। মেডিকেইড অন্তর্ভুক্তির উপযুক্ততার জন্য দারিদ্র্য ও আয়ের নির্দিষ্ট সীমা থাকায় অনেক নিম্ন ও মাঝারি আয়ের মানুষ এর তালিকাভুক্ত হয় না। বিশেষ করে যেসব রাজ্যে মেডিকেইড সম্প্রসারিত হয়নি, সেখানে বিমা ক্রয়ে অসমর্থ মানুষ সরকারি আর্থিক সহায়তা পায় না। বিমা পরিধির (কভারেজ) এই ফাঁকে পড়ে যাওয়া জনগণের মধ্যে আফ্রিকান আমেরিকানরা প্রধান (গারফিল্ড ও অন্যান্য ২০১৯)।

স্বাস্থ্যবিমাহীন থাকার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ওবামাকেয়ারের অধীনেও স্বাস্থ্যসেবা কভারেজের উচ্চ মূল্য থাকায় আফ্রিকান আমেরিকানদের সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা লাভ একটি বড় সমস্যা (টেলর ২০১৯)। আবার স্বাস্থ্যবিমা থাকা সত্ত্বেও প্রিমিয়াম এবং স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধের জন্য নিজের ভাগের ব্যয় বহন করা অনেকের পক্ষে কঠিন হয়। তা ছাড়া রয়েছে সেবার সীমিত পরিধিসহ অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিমার (মূলত বেসরকারি এবং কর্মসূত্রে প্রাপ্ত) সমস্যা। এই ধরনের অপর্যাপ্ত বিমাধারীদের মধ্যে ১৮ শতাংশ আফ্রিকান আমেরিকান (টেলর ২০১৯)। বিমাহীন অবস্থায় উচ্চ চিকিৎসা ব্যয়ের কারণে অনেক পরিবারকে বড় ধরনের চিকিৎসা ঋণের বোঝা বহন করতে হয়, যা তাদের আর্থিক সংকট আরও বৃদ্ধি করে। আবার চিকিৎসা ব্যয়বহুল হওয়ায় অনেক আফ্রিকান আমেরিকান অপর্যাপ্ত বিমার কারণে দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতার নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

মেডিকেয়ার প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করলেও এই ব্যবস্থায় থাকা অপর্যাপ্ততা পূরণের জন্য সম্পূরক বিমা থাকা প্রয়োজন। প্রধান দুটি সম্পূরক বিমার একটি কর্মসূত্রে পাওয়া অবসরকালীন স্বাস্থ্যবিমা, অন্যটি বেসরকারি সম্পূরক স্বাস্থ্যবিমা। মানসম্মত কর্মসংস্থানে পিছিয়ে থাকায় কমসংখ্যক আফ্রিকান আমেরিকানের প্রথম সম্পূরক বিমা থাকে আর দ্বিতীয়টি অবসরকালীন সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের কারণে অধিকাংশ প্রবীণ আফ্রিকান আমেরিকানের পক্ষে ক্রয় করা কঠিন, ফলে তারা অপর্যাপ্ত সেবা লাভ করে (আফ্রিকান আমেরিকান ২০২০)।

অসম স্বাস্থ্যগত ফলাফল

ওবামাকেয়ার বাস্তবায়নের পর বিগত দশকে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে আফ্রিকান আমেরিকানদের স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আসা এবং স্বাস্থ্যসেবা লাভের সুযোগ কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তাদের সার্বিক স্বাস্থ্যগত অবস্থার যে উন্নতি হয়নি, অতিমারিতে তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। তাদের করোনাভাইরাসজনিত মৃত্যুর উচ্চ হার অংশত ব্যাখ্যা করা যায়, কোভিড-১৯ অসুস্থতাকে গুরুতর করতে পারে, এ রকম নানা দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতার ব্যাপক পূর্ব উপস্থিতি দ্বারা (গোল্ড ও উইলসন ২০২০; বারকোভিটস ২০২০; এনসিআরসি ২০২০)। ইতিমধ্যে আলোচিত সামগ্রিক প্রতিকূল অবস্থার

পরিপ্রেক্ষিতে সুদীর্ঘ কাল ধরেই অন্য যেকোনো জনগোষ্ঠীর চেয়ে আফ্রিকান আমেরিকানদের মধ্যে নানা দীর্ঘমেয়াদি রোগজনিত অসুস্থতা যেমন ডায়াবেটিস, হৃদ্‌রোগ, হাঁপানি, এইচআইভি, স্থূলতা, লিভার, ফুসফুস ও কিডনি জটিলতা, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি অত্যন্ত উচ্চ হারে বিদ্যমান। স্বাভাবিক সময়ে এসব রোগে তাদের মৃত্যুহার অন্য যেকোনো জনগোষ্ঠীর চেয়ে অনেক বেশি (ওএমএইচ)। শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে অনেক কম বয়সে তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হয় (জেরোনাইমাস ও অন্যান্য ২০০৬), তাদের গড় আয়ু কম (ওএমএইচ) এবং অকাল ও পরিহারযোগ্য মৃত্যুর হার উদ্বেগজনক (টমাস ও ক্যাসপার ২০১৯)। উচ্চ-নিম্ননির্বিশেষে সব আর্থসামাজিক স্তরে স্বাস্থ্য অবস্থা ও ফলাফলে বর্ণভিত্তিক পার্থক্য স্পষ্ট (জেরোনাইমাস ও অন্যান্য ২০০৬)। গর্ভাবস্থাজনিত জটিলতায় আফ্রিকান আমেরিকান নারীদের মৃত্যুর হার সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বোচ্চ এবং শতাব্দী ধরে এই ব্যবধান অপরিবর্তনশীল (সিডিসি (খ) ২০১৯)। শিক্ষাগত যোগ্যতার মান অনুযায়ী এই পার্থক্যের তারতম্য হয় না, উচ্চশিক্ষিত আফ্রিকান আমেরিকান নারী গর্ভকালীন জটিলতায় ৫.২ গুণ অধিক হারে মৃত্যুবরণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি রোগনিয়ন্ত্রণ সংস্থা (সিডিসি) এই ব্যবধানকে আজকের চিকিৎসাব্যবস্থায় বর্ণভিত্তিক বৈষম্যের জ্বলন্ত নজির বলে উল্লেখ করে (সিডিসি (খ) ২০১৯)।

স্বাস্থ্য অসমতা ও অসুস্থতায় বর্ণবাদ কতটা দায়ী

বর্ণবাদ আফ্রিকান আমেরিকানদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার সক্ষমতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। বর্ণসচেতন সমাজে বাস করার সহজাত ও অব্যাহত উদ্বেগ, অধস্তনতা এবং সুবিধাবঞ্চিত থাকার নিরন্তর মানসিক চাপ দৈহিক অবনতি ও দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। উচ্চ রক্তচাপ, মানসিক রোগ, প্রসবকালীন জটিলতার সঙ্গে মানসিক চাপজনিত শারীরিক অবস্থার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে (উইলিয়ামস ও মোহাম্মেদ ২০০৯; জেরোনাইমাস ও অন্যান্য ২০০৬)। প্রতিদিনের জীবনে প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সূক্ষ্ম বর্ণবৈষম্য ও পার্থক্যমূলক ব্যবহার শরীরে ক্রনিক প্রদাহ সৃষ্টি করে রোগ প্রতিরোধক্ষমতার ক্ষতি করে, ফলে দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় (*সায়েন্স ডেইলি* ২০১৯)।

সমাজে যখন বৈষম্য নিয়মিত এবং স্বাভাবিকভাবে টিকে থাকে, তখন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবায় তার অস্তিত্ব থাকা অস্বাভাবিক না। স্বাস্থ্যসেবায় অধিকাংশ বৈষম্য হয় আচরণের মাধ্যমে, এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণকে অবচেতন ও অনিচ্ছাকৃত ভাবা হয় (উইলিয়ামস ও রকার ২০০০)। ব্যক্তি অন্তর্গত বাঁধাধরা ধারণার ভিত্তিতে অবচেতন মন থেকে এই পক্ষপাত করে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। কারণ, অবচেতন মন থেকে করা বৈষম্যমূলক আচরণের মাধ্যমে

স্বাস্থ্যসেবাদানকারী বর্ণ এবং জাতির ভিত্তিতে পার্থক্যমূলক সেবা দেন (জেসটকট ও অন্যান্য ২০১৬)। এখনো চিকিৎসাসেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি এবং মেডিকেল ছাত্রদের মধ্যে আফ্রিকান আমেরিকানদের সম্পর্কে দাসপ্রথার মধ্যে শিকড়বদ্ধ ধারণা যেমন শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ জৈবিকভাবে (বায়োলজিক্যালি) ভিন্ন, কৃষ্ণাঙ্গদের ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা অসীম ইত্যাদি বাঁধাধরা ধারণা টিকে থাকার প্রবণতা সাম্প্রতিক এক গবেষণা সার্ভেতে প্রমাণিত হয়েছে। এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে এই অন্তর্গত বিশ্বাস বা ধারণা থেকে তারা বর্ণ পার্থক্যমূলক চিকিৎসাপত্র দেয়, বিশেষ করে ব্যথা বেদনার চিকিৎসায় (ব্যাকিন্সকি ২০১৮)।

অতিমারিতে করোনাভাইরাস পরীক্ষা এবং চিকিৎসায় বর্ণ এবং জাতিভিত্তিক পার্থক্যের অভিযোগের (এপিএম ২০২০; এলিগন ও বারচ ২০২০) পরিপ্রেক্ষিতে সিডিসি অসচেতন পক্ষপাত চিহ্নিত ও নিরসনের তাগিদ দিয়েছে (সিডিসি (ঘ) ২০২০)। এপিক হেলথ রিসার্চ নেটওয়ার্ক ২১টি রাজ্যে ৫৩টি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ৫০ মিলিয়ন রোগীর রেকর্ড বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে, অশ্বেতাঙ্গ জনগণ করোনাভাইরাস পরীক্ষার জন্য ক্রমাগত বাধার সম্মুখীন হয়, শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় তাদের পরীক্ষা অধিক বিলম্বিত হয়, যতক্ষণ না অবস্থা গুরুতর হচ্ছে, ফলে তাদের হাসপাতালে ভর্তি এবং মৃত্যুর হার শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। এমনকি আর্থসামাজিক অবস্থা এবং পূর্ব অসুস্থতা একই রকম হলেও এ ক্ষেত্রে বর্ণভিত্তিক পার্থক্য দেখা গেছে (রুবিন-মেলার ও অন্যান্য ২০২০)। এই গবেষণা ফলাফল স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থায় এবং কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বর্ণবৈষম্যকে আরও গুরুত্বসহকারে বিবেচনার প্রয়োজন তুলে ধরেছে।

বৈষম্যের অভিজ্ঞতা স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ এবং মেনে চলার আচরণকেও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। আফ্রিকান আমেরিকানদের স্বাস্থ্যসেবা অনেকটা বাধাগ্রস্ত হয় স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থার প্রতি তাদের সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের কারণে। এই অবিশ্বাসের ভিত্তিমূলে রয়েছে অবমূল্যায়ন এবং অসদাচরণের সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাদের অজ্ঞাতসারে ও বিভ্রান্ত করে গবেষণা নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা ইত্যাদি (ওয়াশিংটন ২০০৭; টমাস ও ক্যাসপার ২০১৯)। অবিশ্বাসের কারণে অনেকেই স্বাস্থ্যবিমা থাকা সত্ত্বেও এর সদ্ব্যবহার কম করে। এই সন্দেহ এতটা প্রবল যে অতিমারির কঠোর অভিঘাত সত্ত্বেও অধিকাংশ আফ্রিকান আমেরিকান চিকিৎসাবিজ্ঞানী বিশ্বাস করতে এবং কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণে শ্বেতাঙ্গ ও হিস্পানিকদের চেয়ে অনেক বেশি দ্বিধান্বিত (গ্রামলিক ও ফাঙ্ক ২০২০)। চিকিৎসা পেশাজীবীদের মধ্যে আফ্রিকান আমেরিকান খুব কম অন্তর্ভুক্ত থাকায় তাঁদের এই অবিশ্বাস দূর করা এবং চিকিৎসার মান উন্নত করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে (আনইকুয়াল ট্রিটমেন্ট 2003)।

উপসংহার

স্বাস্থ্য অসমতার মূল কারণ নানা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অনুঘটক যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত অবস্থা ও কাঠামোগত বৈষম্য থেকে উদ্ভূত হয়ে জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যগত ফলাফলে পার্থক্য সৃষ্টি করে। আফ্রিকান আমেরিকান জনগোষ্ঠীর ওপর অতিমারির অসমানুপাতিক পরিণামের পটভূমি যেমন ঐতিহাসিক ও কাঠামোগত উপাদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তেমনি তার কারণ তাদের অসম আর্থসামাজিক অবস্থা ও স্বাস্থ্যবৈষম্যে নিহিত। স্বাস্থ্যবৈষম্যের অন্যতম মূল প্রপঞ্চ বর্ণবাদ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় এখনো স্বাস্থ্যের সব নির্ধারককে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে কাঠামোগত ব্যবস্থার অনুষঙ্গ হিসেবে আবাসিক এলাকার বর্ণভিত্তিক পৃথক্‌করণের স্থায়ী ব্যবস্থা স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারকে অসমতা সৃষ্টি করে। অতীতে সুদীর্ঘ কাল ধরে আফ্রিকান আমেরিকান-অধ্যুষিত এলাকায় সরকারি সহায়তা, পরিষেবা ও বিনিয়োগ না করার অন্যায্য চর্চা, রেডলাইনিং এবং গৃহায়ণ বৈষম্যের কারণে এই জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত অধিকাংশ এলাকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দারিদ্র্যের কেন্দ্রীভবন, নিম্নমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ, পরিবেশদূষণের উচ্চ মাত্রা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতা, স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা এবং সহিংসতা ও অপরাধপ্রবণতা। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, আয় ও সম্পদে ব্যাপক বর্ণভিত্তিক ব্যবধান অধিকাংশ আফ্রিকান আমেরিকানের জীবনমান উন্নয়ন ও সামাজিক গতিশীলতাকে যেমন ব্যাহত করে, তেমনি উন্নত স্বাস্থ্য অর্জনের অপরিহার্য শর্ত পূরণ বাধাগ্রস্ত করে। বর্ণবৈষম্য, পরিবেশদূষণ, নিম্ন জীবনমান এবং অসম স্বাস্থ্যসেবা একীভূত হয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তাদের দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতার উচ্চ ঝুঁকিতে রাখে। আর্থিক এবং স্বাস্থ্যগত সার্বিক দুর্বল অবস্থার কারণে আফ্রিকান আমেরিকান জনগোষ্ঠীর জীবনে অতিমারির অভিঘাত এতটা কঠোর হয়েছে।

বিগত দশকে যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্যবৈষম্যের কিছু কিছু ক্ষেত্রে মান উন্নয়ন সূচকে অগ্রগতি হলেও সামগ্রিক উন্নতির গতি অত্যন্ত ধীর। এখনো স্বাস্থ্যসেবায় সমতা প্রতিষ্ঠায় বর্ণবাদের মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক প্রভাব বড় বাধা। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের অসচেতন পক্ষপাতমূলক আচরণ স্বাস্থ্যবৈষম্যের অন্যতম কারণ। অন্যদিকে অনুভূত বর্ণবাদ আফ্রিকান আমেরিকানদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। আবার ঐতিহাসিক কারণে চিকিৎসাব্যবস্থার প্রতি আফ্রিকান আমেরিকানদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস তাদের পর্যাপ্ত চিকিৎসাসেবা লাভ বাধাগ্রস্ত করে। স্বাস্থ্যবিমার অভাব ও অপর্যাপ্ত বিমা এবং ব্যয়বহুল চিকিৎসাসেবা এই জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত করে রেখেছে।

বিশ্বের প্রধান দশটি ধনী দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র স্বাস্থ্য খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় করেও ওই সব দেশের মতো সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। অতিমারি

এ ব্যবস্থার দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা এবং স্বাস্থ্যবিমাব্যবস্থার অসংগতি উন্মোচন করেছে। চাকরির মতো একটি অনির্ভরযোগ্য শর্তের ওপর স্বাস্থ্যবিমা প্রাপ্তি এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো মৌলিক প্রয়োজনের নির্ভরতা এই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে। স্বাস্থ্যবৈষম্য দূরীকরণে দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গীকার ও সফল কৌশল যেমন প্রয়োজন, সেই সঙ্গে বর্ণবাদের সর্বব্যাপী প্রভাবকে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠার অন্যান্য বাধার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে স্বাস্থ্যব্যবস্থা সংস্কার প্রচেষ্টায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরি।

তথ্যসূত্র

African Americans and Medicare-Medicare and Medicaid are important to African Americans, National Committee to Preserve Social Security & Medicare, June 28, 2020.

APM Research Lab, The color of coronavirus : Covid-19 deaths by race and ethnicity in the US, 2020.

Bachynski K, American medicine was built on the backs of slaves. And it still affects how doctors treat patients today, *The Washington Post*, June 4, 2018.

Bailey ZD, Krieger N, et al. Structural racism and health inequities in the USA : Evidence and interventions. *The LANCET*, 389 :10077, April 8,2017.

Baranauckas C and Stebbins S, Minorities are disproportionately affected by Covid-19. This is how it varies by state, *USA Today*, July 21, 2020.

Berchick ER, Barnett JC, and Upton RD. Health Insurance Coverage in the United States : 2018 - Current Population Reports, U.S. Census Bureau. Nov. 2019 .

Berkovitz C. Environmental racism has left black communities especially vulnerable to covid-19, The Century Foundation, May19,2020.

Blauner R. Racial oppression in America. Harper and Row, New York : 1972.

Bonilla-Silva E. Rethinking racism : Toward a structural interpretation. *American Sociological Review*.1996, 62 :465-480.

Braveman PA, Cubbin C, Egerter S, Williams DR., Pamuk E. Socioeconomic disparities in health in the United States : What can we learn from the patterns? *American Journal of Public Health*. 2010;100 : 186-196. [PMC free article]

Braveman PA, Gottlieb L. The Social determinants of health : It's time to consider the causes of the causes, Public Health reports, 2014; 129 :19-31 [PMC free article]

Brooks K. Research shows Food Deserts more abundant in minority neighborhoods, *Johns Hopkins Magazine*, Spring 2014.

Brookings. 53 million U.S. workers are making low wages, despite low national unemployment, Metropolitan Policy Program at Brookings. Nov7, 2019.

Buchanan L. Patel JK, Brian M, Rosenthal and Singhvi A. A Month of Coronavirus in New York City : See the Hardest-Hit Areas, *The New York Times*, April 1, 2020.

CDC (a). Race, Ethnicity, and age trends in persons who died from covid-19- United States, Centers for disease control and prevention, May-August, October 23, 2020.

CDC (b). Racial and ethnic disparities continue in pregnancy-related deaths, Centers for disease control and prevention, Sept. 5, 2019.

CDC (c). Infant mortality, Centers for Disease Control and Prevention, 24/7

CDC (d). Health equity considerations and racial and ethnic minority groups. Centers for Disease Control and Prevention, July 24, 2020.

Census Bureau (a). Health Insurance Coverage in the United States : 2018. U.S. Census Bureau, November 2019.

Census Bureau (b). Income and poverty in the United States : 2018. U.S. Census Bureau, September 10, 2019) .

Communities in Action : Pathways to Health Equity, Baciu A, Negussie Y. et al. Editors, Washington (DC) : National Academies Press(US); 2017.

Cooper RS, Kaufman JS, Ward RYK. Race and genomics. New England, Journal of Medicine. 2003; 348 : 1166 -70.

DuBois William E. B. *The Philadelphia Negro : A Social Study*. Schocken Books; New York : 1967. 1899.

EPI. Economic Policy Institute, State of working America data library, (Unemployment by race & education), 2020.

Eligon J and Burch ADS, Questions of Bias in Covid-19 Treatment Add to the Mourning for Black Families, *The New York Times*, May 10, 2020.

Ford TN, Reber S, and Reeves RV, Race Gaps in Covid-19 Deaths are even Bigger than they Appear, *BROOKINGS*, June 16, 2020.

Garfield R, Orgera K, and Damico A. The coverage gap : Uninsured poor adults in states that do not expand medicaid, H. J. Kaiser Family Foundation, March 21,2019.

Gaskin DJ, Thorpe Jr RJ, McGinty EE, Bower K, Rohde C, Young JH, LaVeist TA, Dubay L. Disparities in diabetes : The nexus of race, poverty, and place. *American Journal of Public Health*, 2014; 104(11) : 2147-55. [PMC free article]

Gaskin DJ, Dinwiddie GY, Chan KS, McCleary RR. Residential segregation and the availability of primary care physicians. *Health Services Research*. 2012,47(6) : 2353-2376. [PMC free article]

GAO (U.S. Government Accountability Office). K-12 education : Better use of information could help agencies identify disparities and address racial discrimination. U.S. Government Accountability Office; October 31, 2016.

Geronimus, A. T., Hicken M., et al., Weathering and Age Patterns of Allostatic Load Scores Among Blacks and Whites in the United States, *American Journal of Public Health*, May 2006.

Goldman D, Smith JP. The increasing value of education to health. Social Science & Medicine. 2011,72(10). [PMC free article]

Gould E and Wilson V. Black Workers Face Two of the Most Lethal Preexisting Conditions for Coronavirus - Racism and Economic Inequality, Economic Policy Institute, June 1, 2020.

Gramlich J and Funk C. Black Americans face higher covid-19 risks, are more hesitant to trust medical scientists, get vaccinated, Pew Research Center, June 4, 2020.

Gundersen C and Ziliak JP, Food insecurity and health outcomes, *Health Affairs*, November 2015.

Hammonds E.M., and Reverby S.M., Toward a historically informed analysis of racial health disparities since 1619, *American Journal of Public Health*, Sept. 4, 2019.

Hanks A, Solomon D, and Weller CE. Systematic inequality : How America's structural racism helped create the Black-White wealth gap, Center for American Progress. February 21, 2018.

Hayward MD, Miles TP, Crimmins EM, Yang Y. The significance of socioeconomic status in explaining the racial gap in chronic health conditions. American Sociological Review. 2000 :910-930.

Heckler Report. Report of the secretary's task force on black and minority health, Washington (DC), U.S. Dept of Health and Human Services, 1985.

Illinois Department of Public health, Covid-19 statistics.

Jan Tracy, Redlining was banned 50 years ago. It's still hurting minorities today. *The Washington Post*, March 28, 2018.

Jones JM. *Prejudice and racism*. New York, NY : McGraw-Hill Inc; 1997.

Jones, J, Schmitt, J., and Wilson,V. 50 Years After The Kerner Commission, Economic Policy Institute, Feb. 26, 2018.

Kaiser.Key facts about the Uninsured population, Henry J. Kaiser Family Foundation, December 7, 2018.

Krieger Nancy, Shades of difference : Theoretical underpinnings of the medical controversy on black/white differences in the United States, 1830-1870. *International Journal of Health Services*. 1987, 17,259-278.

Massey Douglas S. Segregation and stratification : a biosocial perspective. Du Bois Review : *Social Science Research on Race*. 2004, 1 :7-25.

Massey DS, and Denton NA. *American apartheid : Segregation and the making of the underclass.* Harvard University Press : Cambridge, Massachusetts, 1993.

Mays, Jeffery C. and Newman, Andy, Virus is Twice as Deadly for Black and Latino People than Whites in N.Y.C., *The New York Times*, April 8,2020 Updated June 26, 2020.

Michigan data, Michigan.Gov

Millet GA, Jones AT, Benkeser JD, et al., Assessing differential impacts of Covid-19 on Black Communities, *Annals of Epidemiology*, Vol.47, July 2020, 37-44.

Mikati I, Benson AF et al. Disparities in distribution of particulate

matter emission sources by race and poverty status. *American Journal of Public Health*, 108, 4 : 480-485.

Mitchell B and Franco J, HOLC 'Redlining' Maps : The Persistent Structure of Segregation and Economic Inequality, NCRC, March 20,2018.

NCRC. Redlining and neighborhood health. National Community Reinvestment Coalition. September 10, 2020.

NPR, Harvard. The Impact of coronavirus on households, by race/ethnicity. NPR, Robert Wood Johnson Foundation, Harvard T.H. Chan School of Public Health, September, 2020.

OMH. U.S. Department of Health and Human Services, Office of Minority Health, Minority Population Profile.

Oppel R A, Gebeloff R. Rebecca Lai K k, Wright W, and Smith M, The Fullest Look Yet at the Racial Inequity of Coronavirus, *The New York Times*, July 5, 2020.

Papanicolas I, Woskie L R, Jha A K, Health Care Spending in the United States and Other High- Income Countries, Journal of the American Medical Association (JAMA) 2018.

Perry AM, Rothwell J and Harshbarger B, The devaluation of assets in Black neighborhoods, Brookings Institute, Nov. 27, 2018.

"Quick Facts", U.S. Census Bureau, accessed Nov.15, 2019.

Roeder A, Understanding slavery's legacy in health and medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health, May 8, 2017.

Rothstein Richard, *The Color of Law : A Forgotten History of How Our Government Segregated America*, 2017. New York : Liveright.

Rubin-Miller L, Alban C, Artiga S, and Sullivan S, "Covid-19 Racial Disparities in Testing, Infection, Hospitalization, and Death : Analysis of Epic Patient Data, KFF Kaiser Family Foundation, Sept. 16, 2020.

Sass Jennifer. 2013. “Air Pollution Linked to Deadly Lung Cancer.” *Expert Blog* (Natural Resources Defense Council), October 17, 2013.

Science Daily, Racism has a toxic effect, May 31, 2019.

Taylor Jamila, Racism, inequality, and health care for African Americans. The Century Foundation, Dec.19, 2019.

Thomas SB and Casper E, The burdens of race and history on black people's health 400 years after Jamestown, *American Journal of Public Health*, October 2019, 109(10).

Brian D. Smedley, Adrienne Y. Stith, and Alan R. Nelson (ed.), *Unequal Treatment - Confronting Racial and Ethnic Disparities in Health care*, Institute of Medicine; Washington(DC) : National Academies Press(US), 2003.

Urban health institute blog, 400 years later, The legacy of slavery on health equity, Johns Hopkins Urban Health Institute, 2019.

Washington HA, Medical apartheid : The Dark History of Medical Experimentation on Black Americans from Colonial Times to the Present, Doubleday, 2007.

Williams DR and Rucker TD, Understanding and Addressing Racial Disparities in Health Care, PubMed Central (PMC), Summer 2000.

Williams DR., Mohammed SA. Discrimination and racial disparities in health : evidence and needed research. *Journal of Behavioral Medicine*. 2009, 32 :20-47. [PMC free article]

Williams DR and Sternthal M, Understanding racial/ethnic disparities in health : Sociological contributions, PMC, U.S, National Library of Medicine, National Institutes of Health, Oct 10, 2012.

Williams DR and Collins C. Racial residential segregation : A fundamental cause of racial disparities in health, Public Health Reports. 2001 : 116.

PMC free article

Williams DR and Collins C. US socioeconomic and racial differences in health : Pattern and explanations, *Annual Review of Sociology*, 1995, 21 :349-386.

Zestcott CA, Blair IV, Stone J. Examining the presence, consequences, and reduction of implicit bias in health care : A narrative review. *Group Processes & Intergroup Relations*. 2016,19(4) :528-542. [PMC free article]

সমীক্ষা

করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তনশীল পদ্ধতি : ১৬ দেশের মধ্যে তুলনা

রাজীব চৌধুরী, কেভিন হেং, মো. সাজেদুর রহমান শাওন, গ্যাব্রিয়েল গো, ডেইজি ওকোনোফুয়া, ক্যারোলিনা ওচোয়া-রোসালেস, ভ্যালেন্টিনা গঞ্জালেস-জারামিল্লো, আব্বাস ভূঁইয়া, ড্যানিয়েল রিডপাথ, শামিনি প্রথাপন, সারা শাহজেদ, ক্রিশ্চিয়ান এল. আলথুস, নাথালিয়া গঞ্জালেস-জারামিল্লো, ওসকার এইচ. ফ্রাঙ্কো

সারসংক্ষেপ

কোভিড মোকাবিলায় এখন পর্যন্ত ওষুধবিহীন পরিহারমূলক ব্যবস্থাই (এনপিআই) বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। তবে এতে স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর চাপ সামলানো গেলেও দীর্ঘ মেয়াদে মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর এর প্রভাব পড়ে। তাই অনেক দেশ লকডাউন প্রত্যাহারের চিন্তা করা শুরু করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এনপিআইয়ের মাঝে মাঝে সামাজিক দূরত্বের বিধি শিথিল করা অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থা হতে পারে। এই প্রবন্ধে আমরা সব ব্যবস্থার সম্ভাব্য পরিণতি দেখিয়েছি, অর্থাৎ টানা এনপিআই চালানো হলে কী হতে পারে এবং মাঝে মাঝে শিথিলতা দেওয়া হলে কী হতে পারে। আর তা করা হয়েছে বিভিন্ন আয়ের ১৬টি দেশের প্রেক্ষাপটে। তাতে দেখা গেছে, পরিবর্তনশীল পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে ভালো ফল পাওয়া যায়। নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে দীর্ঘদিন সামাজিক দূরত্বের বিধান মানা সম্ভব নয়। সে জন্য এই দেশগুলোতে কঠোরভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পর শিথিলতা দেওয়া বাস্তবসম্মত, তাতে জীবন-জীবিকার মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব। এ রকম পরিবর্তনশীল ব্যবস্থার সুবিধাগুলো এরূপ : ১. রোগের জটিলতা হ্রাস পায়, ২. প্রতিরোধমূলক ও চিকিৎসাবিষয়ক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়, ৩. বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক দুর্ভোগ লাঘব হয়।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

করোনাভাইরাস, পূর্বাভাস মডেলিং, পরিবর্তনশীল পদ্ধতি, ছোঁয়াচে রোগ, রোগবিস্তার-সংক্রান্ত বিদ্যা।

● অনুবাদ : **প্রতীক বর্ধন**

কোভিড-১৯ মহামারি বৈশ্বিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা, সমাজ ও সরকারের জন্য এক অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে[১]। ২০২০ সালের ১৬ মে পর্যন্ত বিশ্বের সব দেশেই সার্স কোভ-২ চিহ্নিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৬ লাখ মানুষ নিশ্চিতভাবে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে। মৃতের সংখ্যাও ৩ লাখ ছাড়িয়ে গেছে[২]। মহামারিসংক্রান্ত সাম্প্রতিক এক মডেলে দেখা গেছে, বৈশ্বিক সম্প্রদায় এই পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ না করলে বিশ্বজুড়ে এ বছর ৪ কোটি মানুষ মারা যেতে পারত[৩]। আজ পর্যন্ত এই রোগ প্রতিরোধের ওষুধ পাওয়া যায়নি। সে কারণে রোগ সংক্রমণ ঠেকানোর লক্ষ্যে বিশ্ব সম্প্রদায় মূলত প্রতিকারমূলক সামাজিক ব্যবস্থার (ওষুধবিহীন) ওপর নির্ভর করছে-ইংরেজিতে যাকে বলে নন-ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্টারভেনশন (এনপিআই)[৪]। এনপিআই মূলত রোগ ছড়িয়ে পড়তে না দেওয়ার কৌশল-চিহ্নিত ও বিচ্ছিন্নকরণ। অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা, বিদ্যালয় বন্ধ, জনসমাগম বন্ধ ও লকডাউন-অর্থাৎ সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে রোগ যেন একজন থেকে আরেকজনে ছড়িয়ে না পড়ে, এনপিআই মূলত সেই কৌশল[৫]।

এনপিআই কার্যকর[৪,৬,৭] তবে এর কিছু নেতিবাচক দিকও আছে। যেমন দীর্ঘ লকডাউনে মানুষ বেকার হয়ে পড়ে, অর্থনৈতিক কষ্ট বেড়ে যায় এবং সামাজিক জীবন ব্যাহত হয়। নানা জরিপে দেখা গেছে, লকডাউনের কারণে নিম্ন আয়ের মানুষের আয় ৭০ শতাংশ এবং ভোগ ব্যয় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পায়[৮]। সব দেশের সক্ষমতা এক নয়। সে কারণে এভাবে পাইকারি হারে লকডাউন আরোপ করা টেকসই কি না, তা নিয়ে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে। আবার অর্থনৈতিক সক্ষমতার সঙ্গে স্বাস্থ্য খাতের সক্ষমতাও জড়িত[৯]। ফলে অনেক দেশই লকডাউন প্রত্যাহারের চিন্তা করে, যদিও এতে রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল এনপিআই মডেল প্রয়োজন, যেখানে সামাজিক দূরত্বের বিধানে শিথিলতা থাকবে। সম্ভবত, এটিই বাস্তবসম্মত। এতে মানুষের আর্থসামাজিক জীবন তেমন একটা ব্যাহত হবে না। তবে এ ব্যাপারে এখনো কিছু অনিশ্চয়তা আছে: ১. এই ধরনের ব্যবস্থার স্থায়িত্ব কত দিন এবং কত দিন পরপর তা কার্যকর করা হবে, ২. শিথিল করার জন্য কোন সময়টা আদর্শ হবে, যাতে আবার রোগের সংক্রমণও বাড়বে না, এবং ৩. একেক দেশের বাস্তবতা যেহেতু একেক রকম, তাই এই পরিস্থিতিতে কোন মডেল গ্রহণ করা হবে। পরিস্থিতি সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর নীতি প্রণয়নে এই সব বিষয় আমলে নিতে হবে। এতে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা যেমন ভেঙে পড়বে না, তেমনি অকালমৃত্যু ঠেকানো যাবে। জাতীয় অর্থনীতিতে ক্ষতিকর প্রভাবও মোকাবিলা করা যাবে।

এই অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় আমরা ১৬টি ভিন্ন সক্ষমতার দেশের তথ্য-উপাত্ত তুলনা করে রোগ সংক্রমণের এক পরিবর্তনশীল মডেল প্রণয়ন করেছি। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে: ১. এই দেশগুলোতে রোগের বয়সভিত্তিক তীব্রতা ও মৃত্যুহার হিসাব করা, ২. প্রতিটি দেশে অনিয়ন্ত্রিত মহামারির প্রভাব নিরূপণ, বিশেষ করে বিদ্যমান

স্বাস্থ্যব্যবস্থার সাপেক্ষে (কাউন্টারফ্যাকচুয়াল), ৩. ১৮ মাসের মেয়াদে নিরবচ্ছিন্ন লকডাউন এবং শিথিলের কৌশল তুলনা (টিকা হাতে পাওয়ার চূড়ান্ত সময়[১০]), ৪. সংক্রমণের তীব্রতা নাগালের মধ্যে রাখার কৌশল প্রণয়ন এবং একই সঙ্গে এই সব হস্তক্ষেপের সম্ভাব্য মেয়াদ বিবেচনা করা।

পদ্ধতি

পূর্বাভাস মডেল প্রণয়নে ব্যবহৃত টাইপড রিপোর্টিং গাইডলাইন ব্যবহার করে এই সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে।

সমীক্ষা প্রণয়ন, তথ্যের উৎস ও পরিপ্রেক্ষিত

কোভিড-১৯ কীভাবে ছড়ায়, তা বোঝার জন্য আমরা বিভিন্ন এনপিআইয়ের সাপেক্ষে পূর্বাভাসের বহুবিধ মডেল ব্যবহার করেছি। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের বয়স ও অন্যান্য রোগে ভোগার ইতিহাস দেশ এবং অঞ্চলভেদে ভিন্ন হবে জেনে আমাদের হাইপোথিসিস হচ্ছে, এনপিআইয়ের মৃত্যুহারও ওই সব মানদণ্ড সাপেক্ষে ভিন্ন হবে। আর সেই হার যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য হবে। তাই এই সমীক্ষার জন্য আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতির কথা আগেই ভেবে রেখেছি। প্রথমত, আমরা মহামারির গতি-প্রকৃতি বোঝার জন্য বয়সভিত্তিক ক্লিনিক্যাল ডাইনামিক এস্টিমেট ব্যবহার করেছি, সে জন্য বিভিন্ন দেশের (বৈশ্বিক জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ) বয়সভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসব দেশ বাছাই করেছি : পশ্চিম ইউরোপ (নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম), দক্ষিণ আমেরিকা (চিলি, কলম্বিয়া), উত্তর আমেরিকা (মেক্সিকো), আফ্রিকা (দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, উগান্ডা), দক্ষিণ এশিয়া (ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা), পশ্চিম এশিয়া (ইয়েমেন), প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল (অস্ট্রেলিয়া)। তৃতীয়ত, আমরা প্রতিটি ঘরানার দেশ থেকে এই দেশগুলো বাছাই করেছি, বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞানুসারে এই দেশগুলোকে এভাবে ভাগ করা যায়—উচ্চ আয়ের দেশ থেকে চারটি দেশ, উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ থেকে চারটি এবং নিম্ন-মধ্যম ও নিম্ন আয়ের দেশগুলো থেকে চারটি করে দেশ।

হস্তক্ষেপের নমুনা, পূর্বাভাসের সূচক ও ফলাফল

বাড়িতে যাঁরা স্বেচ্ছায় আলাদা, আছেন তাঁদেরসহ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকা এবং সমগ্র জনগোষ্ঠীর পৃথক থাকার প্রবণতাকে আমরা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করেছি। এই সময়ে ভাইরাসের বংশবিস্তার কতটা হ্রাস পেল, তার ভিত্তিতে আমরা হস্তক্ষেপের সফলতা-বিফলতা পরিমাপ করেছি (R)। সে জন্য আমরা ভাইরাসের বংশবিস্তারের মৌলভিত্তির[১৩] মান নির্ণয় করেছি ২.২-ভাইরাসের

অনিয়ন্ত্রিত বিস্তারের ক্ষেত্রে। আর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণের পর আমরা ভাইরাসের বংশবিস্তারের কার্যকর হার নির্ধারণ করেছি ০.৮ ও ০.৫। সম্প্রতি আরভিসসহ[১৪] আরও কয়েকজনের সমীক্ষার ভিত্তিতে এই সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাঁরা দেখেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি সামাজিক দূরত্বের বিধান মানলে সংক্রমণ দৈনিক গড়ে ৭৩ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পায়। এই ধরনের হস্তক্ষেপ না করলে *R0*-এর মান দাঁড়ায় ২.৬। আর হস্তক্ষেপের পর এর মূল্য দাঁড়ায় *R*=০.৬২। তবে এই পরিবর্তনের মোক্ষম কারণটি সম্পর্কে একধরনের ধোঁয়াশা থাকলেও *R*-এর কার্যকর মান ০.৫ ও ০.৮ নির্ধারণ করা হয়েছে, তা এই ফলাফলের ভিত্তিতে করা হয়েছে। তবে বেশ কিছু ইউরোপীয় দেশের হিসাবের সঙ্গে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর শিথিল হোক বা কড়া, লকডাউনে যে কিছু কাজ হয়, তা-ও বোঝা যায়[১৫]।

এই মনোভঙ্গির ভিত্তিতে আমরা হস্তক্ষেপের এই চিত্রগুলো বিবেচনা করেছি : ১. একদম কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না করলে কী দাঁড়ায়, ২. ধারাবাহিকভাবে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা (বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন—সাধারণভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেওয়া, স্কুল বন্ধ, সামাজিক জমায়েত বন্ধ, টারগেট *R*=০.৮) এবং তারপর আবার লকডাউন শিথিল করা (তবে আক্রান্ত বা উপসর্গযুক্ত ব্যক্তিদের ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আলাদা রাখতে হবে), ৩. ধারাবাহিকভাবে লকডাউন আরোপ (শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য লকডাউনসহ অতিরিক্ত ব্যবস্থা; টার্গেট *R*=০.৫) এবং তারপর আবার শিথিলতা, ৪. শিথিলতা ছাড়া ধারাবাহিকভাবে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা।

এ ধরনের হস্তক্ষেপ ছাড়া ৫০ দিনে সংক্রমণ হ্রাস-বৃদ্ধিও একটি পর্যায় বিবেচনা করা হয়েছে, সেটাকে আবার হস্তক্ষেপের একটি কাল হিসেবেও বিবেচনা করা হয়েছে। সময়টা এর চেয়ে সামান্য বাড়ানো হলেও (৬০ দিন) ফলাফলে তারতম্য ঘটেনি। শিথিলতার মেয়াদ এই কঠোর সময়ের চেয়ে কম হতে হবে, যদি আমরা তা কার্যকর করতে চাই। সে জন্য এই মধ্যবর্তী কাল আমরা ৩০ দিন নির্ধারণ করেছি। প্রাথমিকভাবে জনগোষ্ঠীর কত অংশ সংক্রমিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে এই হস্তক্ষেপের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই সমীক্ষায় প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে অনুকূল ফলাফল হিসেবে যে মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো হলো : ১. আইসিইউ শয্যার চাহিদা, ২. এনপিআইয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৃত্যু ও হাসপাতালে ভর্তি হাওয়ার হার। ১৮ মাসের কালপর্বে এটি বিবেচনা করা হবে। এই সমীক্ষায় মূলত আইসিইউতে ভর্তি হওয়ার হারকে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার চিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কারণ, অনেক স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এই স্বাস্থ্যব্যবস্থায় অনেক ঘাটতি আছে। স্বাভাবিকভাবে এই ঘাটতির কারণেই কোভিড-১৯-এর পরিণতি অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক আকার ধারণ করে।

মডেলের শক্তিমত্তা নিরূপণ ও বয়স ভিত্তি নির্ধারণের পরিসংখ্যান মডেল

এই বিশ্লেষণে বেশ কয়েকটি ভাগ করা হয়েছে। সন্দেহজনক-সংস্পর্শে আসা-সংক্রমিত-সুস্থ—এই চারটি ভাগে বিশ্লেষণ বিভক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের এনপিআইয়ের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ১৬টি দেশে সার্স কোভ-২-এর সংক্রমণ কতটা ছড়িয়েছে, তা পরিমাপ করা হয়েছে। এ ছাড়া হাসপাতাল ও আইসিইউতে ভর্তির হারকেও পৃথক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ধরা যাক, সন্দেহভাজন ব্যক্তি S সংক্রমিত ব্যক্তি I দ্বারা β হারে আক্রান্ত হয়েছেন। ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির সময় গড়ে ৫ দশমিক ২ দিন[১৭] ধরা যাক। এই সময়ের পর ভাইরাসের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তি E সংক্রমিত হয়ে I হচ্ছেন। এরপর তিনি হয় Y হারে সংক্রমণমুক্ত হচ্ছেন, অথবা fp সম্ভাবনায় তীব্রভাবে সংক্রমিত হচ্ছেন। সংক্রমণের পর্যায়কাল ধরা হয়েছে ২.৩ দিন, ক্রমিক বিরতি ও বংশবিস্তারের ৭.৫ দিনের[১৭] সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। fp হচ্ছে সংক্রমিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের হাসপাতালে যেতে হয়েছে, তাদের অনুপাত। এর জন্য আমরা চীনের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিশ্লেষণ থেকে বয়সভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করেছি[১৮]।

এই বয়সভিত্তিক ধারণার ভিত্তি প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কোন দেশে কোন বয়সের কতজন সংক্রমিত ব্যক্তির হাসপাতালে যেতে হয়েছে, তার অনুপাত বের করেছি। আমাদের হিসাবে, তীব্র সংক্রমণের পর হাসপাতালে নিতে সময় লেগেছে ২ দশমিক ৭ দিন[৪]। তীব্রভাবে সংক্রমিত ব্যক্তি p হাসপাতালে প্রবেশ করছেন h হিসেবে। এরপর তারা হয়তো k হারে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন, অথবা তাদের আইসিইউতে ভর্তির হার fu। কোন বয়সের কত মানুষের আইসিইউ সেবার প্রয়োজন হয়েছে, তা বের করতে আমরা ইমপেরিয়াল কলেজের কোভিড-১৯ রেসপন্স টিমের প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করেছি, এরপর তা প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। $1/k$-এর মেয়াদ হচ্ছে হাসপাতালের থাকার সময়—আইসিইউ ব্যতীত। আমাদের বিবেচনায় এটি আট দিন[৪]। এরপর এদের একটি অংশ মারা গেছে (fd)। কোন বয়সের কতজন মারা গেছে, তা বের করার জন্য আমরা ভেরিটির কাজের দ্বারস্থ হয়েছি[১৮]। এরপর প্রতিটি দেশে বয়সভিত্তিক মৃত্যুহার বের করা হয়েছে। নানা গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে আমরা অভীষ্ট ফল বের করার চেষ্টা করেছি।

ফলাফল : দেশভিত্তিক বৈশিষ্ট্য ও চিকিৎসার প্রকৃতি

জনমিতি ও স্বাস্থ্যসেবাবিষয়ক যে টেবিল-১ উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে জরিপের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর জনমিতি ও স্বাস্থ্যসেবাবিষয়ক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশগুলোকে আয়ের নিরিখে ভাগ করা হয়েছে। সংক্ষেপে বললে, জনসংখ্যার দিক থেকে দেশগুলোর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে (বেলজিয়ামে যেখানে ১ কোটি ১৬ লাখের মতো জনসংখ্যা, সেখানে ভারতে ১৩৬ কোটি)।

দেখা গেল, উচ্চ আয়ের দেশগুলোর তুলনায় নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে সংক্রমণ বেশ পরে চিহ্নিত হয়েছে। এ ছাড়া এই দেশগুলোর স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় বড় ধরনের পার্থক্য আছে। নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে আইসিইউ শয্যার সংখ্যা জনসংখ্যার প্রতি ১০০০ জনে একজন ও এক লাখে একটি করে।

বয়সভিত্তিক সংক্রমণের তীব্রতা ও মৃত্যুহার টেবিল-২ এ সংক্ষেপিত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই ১৬টি দেশের চিকিৎসাব্যবস্থার গতি-প্রকৃতিও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানেও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, নিম্ন আয়ের দেশের তুলনায় উচ্চ আয়ের দেশে সংক্রমণের তীব্রতা বেশি। যেমন উগান্ডায় সংক্রমিত ব্যক্তিদের মধ্যে ১.৬১ শতাংশের হাসপাতালে যেতে হয়েছে, সেখানে নেদারল্যান্ডসে তা ৬.১২%। আবার হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা ব্যক্তিদের ক্রিটিক্যাল কেয়ারের ক্ষেত্রেও একই ধারা দেখা যায়। মৃত্যুহারের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য—বুরকিনা ফাসোতে যেখানে মৃত্যুহার ০.১৭, বেলজিয়ামে তা ১.১৩।

টেবিল-১ : ১৬টি দেশের জনমিতি ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সূচক

দেশ	জনসংখ্যা	প্রাথমিক আক্রান্তের সংখ্যা	প্রথম আক্রান্তের ঘটনা	প্রতি হাজারে হাসপাতালের শয্যা	মোট হাসপাতাল শয্যা	মোট আইসিইউ শয্যা	প্রতি লাখে আইসিইউ শয্যা
অস্ট্রেলিয়া	২৫,২০৩,২০০	৯,৬১৮	২৫/০১/২০	৩.৮	৯৫,৭২২	২২০০	৮.৭
বেলজিয়াম	১১,৫৩৯,৩২৬	১১,৮৯৯	০৪/০২/২০	৬.২	৭১,৫৪৪	১৯০০	১৬.৫
চিলি	১৮,৯৫২,০৩৫	২৪৪৯	০৩/০৩/২০	২.২	৪১,৬৯৪	১০০০	৫.৩
নেদারল্যান্ডস	১৭,০৯৭,১২৩	১১,৭৫০	২৭/০২/২০	৪.৭	৮০,৩৫৬	১১৫০	৬.৭
কলম্বিয়া	৫০,৩৩৯,৪৪৩	৭০২	০৬/০৩/২০	১.৫	৭৫,৫০৯	৫৬০০	১১.১
মেক্সিকো	১২৭,৫৭৫,৫২৮	৯৯৩	২৮/০২/২০	১.৫	১৯১,৩৬৩	৩০০০	২.৪
দক্ষিণ আফ্রিকা	৫৮,৫৫৮,২৬৭	১৩২৬	০৫/০৩/২০	২.৫	১৪৬,৩৯৬	১৫০০	২.৬
শ্রীলঙ্কা	২১,৩২৩,৭৩৪	১১২	২৭/০১/২০	৩.৬	৭৬,৭৬৫	৫১৯	২.৪
বাংলাদেশ	১৬৩,০৪৬,১৭৩	৪৯	০৮/০৩/২০	০.৮	১৩০,৪৩৭	১১৭৪	০.৭
ভারত	১,৩৩৬,৪১৭,৭৫৫	১২৫১	৩০/০১/২০	০.৯	১,২২৯,৭৭৬	২৯,৯৯৭	২.২
নাইজেরিয়া	২০০,৯৬৩,৬০৩	১১১	২৭/০২/২০	০.৫	১০০,৪৮২	১২৮	০.১
পাকিস্তান	২১৬,৫৬৫,৩১৭	১৮৬৫	২৬/০২/২০	০.৬	১২৯,৯৩৯	৩১৪২	১.৫
আফগানিস্তান	৩৮,০৪১,৭৫৭	১৬৬	২৪/০২/২০	০.৫	১৯,০২১	১০০	০.৩
বুরকিনা ফাসো	২০,৩২১,৩৮৩	২৪৬	০৯/০৩/২০	০.৪	৮,১২৯	৫০	০.২
তানজানিয়া	৫৮,০০৫,৪৬১	১৯	১৬/০৩/২০	০.৭	৪০,৬০৪	৩৮	০.১
উগান্ডা	৪৪,২৬৯,৫৮৭	৩৩	২০/০৩/২০	০.৫	২২,১৩৫	৫৫	০.১

বিভিন্ন দেশের প্রতিবেদন ও বিশ্বব্যাংকের হাসপাতাল শয্যাসংক্রান্ত প্রতিবেদন থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

টেবিল ২ : বয়সভিত্তিক রোগের তীব্রতা ও মৃত্যুহার

দেশ	আক্রান্ত ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তির হার (%)	হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর ক্রিটিক্যাল কেয়ারের প্রয়োজনীয়তা (%)	ক্রিটিক্যাল কেয়ারে থেকে মৃত্যুহার (%)	ইনফেকশন ফ্যাটালিটি রেট (আইএফআর) %
অস্ট্রেলিয়া	৫.৩৪	২৯.৩	৫৯.৬	০.৯৩
বেলজিয়াম	৬.০১	৩১.৫	৫৯.৬	১.১৩
চিলি	৪.৬৯	২৫.৮	৫৯.৫	০.৭২
নেদারল্যান্ডস	৬.১২	৩০.৬	৫৯.৬	১.১২
কলম্বিয়া	৩.৯৩	২৩.৩	৫৯.৪	০.৫৪
মেক্সিকো	৩.৫৭	২২.৩	৫৯.৪	০.৪৭
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩.০৯	১৯.১	৫৯.২	০.৩৫
শ্রীলঙ্কা	৪.৩৮	২৪.২	৫৯.৫	০.৬৩
বাংলাদেশ	৩.১০	১৯.৬	৫৯.৩	০.৩৬
ভারত	৩.৩৫	২০.৩	৫৯.৩	০.৪১
নাইজেরিয়া	১.৯৬	১৬.৩	৫৯.১	০.১৯
পাকিস্তান	২.৫৫	১৯.০	৫৯.২	০.২৯
আফগানিস্তান	১.৮৬	১৬.৪	৫৯.১	০.১৮
বুরকিনা ফাসো	১.৮১	১৬	৫৯	০.১৭
তানজানিয়া	১.৯০	১৬.৩	৫৯	০.১৮
উগান্ডা	১.৬১	১৫.১	৫৮.৯	০.১৫

জনগোষ্ঠীর বয়সের কাঠামো অনুসারে এসব হিসাব প্রমিতকরণ করা হয়েছে।

মডেল উন্নয়ন ও হস্তক্ষেপের সম্ভাব্য ফলাফল

সরকার রোগ নিয়ন্ত্রণে এনপিআই গ্রহণ না করলে আইসিইউ শয্যার চাহিদা অনেকটা বেড়ে যেত। সরকার ব্যবস্থা নেবে না, তা হয় না। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে প্রতিটি দেশের আইসিইউ শয্যার চাহিদা জোগানের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যেত। এই পরিস্থিতিতে জরিপে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৮ লাখ ৪০ হাজার ৪৪০। ২০১৭ সালে এই দেশগুলোতে যত মৃত্যু হয়েছে, এই সংখ্যাটা তার প্রায় ৪৬ শতাংশ হতো। এর বাইরে মহামারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে উচ্চ আয়ের দেশে ৫ লাখ ৮৩ হাজার ৭৩৮, উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে ১০ লাখ ২৬ হাজার ৩৬১, নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে ৬ লাখ ২২০ ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে ২ লাখ ৩০ হাজার ১২৫ জনের মৃত্যু হতে পারত। এই মৃত্যুর বড় একটি অংশ ভারতে হতে পারত, বিশেষ করে দেশটির বিপুল জনসংখ্যার কারণে। এই পরিস্থিতিতে অধিকাংশ দেশে এই মহামারির ব্যাপ্তি হতো ২০০ দিন।

কথা হচ্ছে, ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা ৫০ দিন চালানোর পর ৩০ দিনের জন্য তা আবার শিথিল করা হলে ভাইরাসের বংশবিস্তার *R*-এর মান দাঁড়াত ০.৮। এটা সব দেশের জন্যই প্রযোজ্য। তবে হাসপাতালে ক্রিটিক্যাল কেয়ারে রোগী

ভর্তির হার সক্ষমতার মধ্যে রাখার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। এই হস্তক্ষেপের মধ্যে দেখা যায়, উচ্চ আয়ের দেশে মহামারির ব্যাপ্তি ছিল এক বছর। অন্যান্য ক্ষেত্রে তা ১৮ বছর। এ ছাড়া সব দেশেই প্রথম তিন মাসে সংক্রমণ রোধের ব্যবস্থা জারি ছিল। কিন্তু প্রথমবার তা শিথিল করার পর সব দেশেই হাসপাতালে রোগীর সংকুলান না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এতে ৩৫ লাখ ৩৪ হাজার ৭৯৩ জন মানুষের মৃত্যু হতো। এর বিপরীতে আমরা দেখেছি, ৫০ দিনের লকডাউন বা বিধিনিষেধের পর ৩০ দিনের জন্য তা শিথিল করা হলে আইসিইউ শয্যার চাহিদা সক্ষমতার মধ্যেই রাখা যেত। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, *R*-এর মান ০.৫-এর মধ্যে রাখা। তবে এই ব্যবস্থায় হতো কি, বিধিনিষেধ ও কড়াকড়ির প্রতিটি চক্রের পর কিছু মানুষ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকত। এতে মহামারির ব্যাপ্তি আরও বেড়ে যেত। তবে এই সময়ে বৈশ্বিক মৃত্যু ১ লাখ ৩১ ৬৪৩-এর মধ্যে থাকত।

টেবিল-৩-এ সব পরিসংখ্যানের সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে—১৬টি দেশে সংক্রমণ রোধে কড়াকড়ি আরোপ, হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান। যেখানে সংক্রমণ রোধে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে এবং যেখানে হয়নি, সেই সব দেশেই মহামারির চূড়ায় দৈনিক সংক্রমণের হার অনেকটাই বেশি ছিল। আর নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে কড়াকড়ি ও শিথিলতার পর নতুন সংক্রমণ ও আইসিইউ শয্যার চাহিদা উভয়ই বেড়ে গেছে। কড়াকড়ি আরোপের মডেলে দেখা যায়, উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৪৯৯, উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে ২ হাজার ৭০০, নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে ২৭ লাখ ১৬২ ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে ১ লাখ ৪ হাজার ২৯৭ জনের মৃত্যু হতে পারত। রোগ প্রশমনের কৌশল গ্রহণে এই পরিস্থিতি হতে পারে। আবার রোগ দমনের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের পর যা হতে পারে, তা হলো এই : উচ্চ আয়ের দেশে ৬৩ হাজার ১৬৬, উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে ৩২ হাজার ৪১৯, নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে ৩২ হাজার ২১০ ও নিম্ন আয়ের দেশে ৩ হাজার ৮৪৮ জনের মৃত্যু।

এখন সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি, বছরব্যাপী রোগ প্রশমন বা দমনের কৌশল গ্রহণ করলে রোগীর সংখ্যা হাসপাতালের শয্যার সংখ্যার মধ্যে সীমিত রাখা যায়। দমনের ক্ষেত্রে হয়তো দেখা যেত, অধিকাংশ দেশে তিন মাসে নতুন রোগী পাওয়া যেত না। আর দীর্ঘমেয়াদি রোগ প্রশমনের ক্ষেত্রে দেখা যেত, এই পরিস্থিতিতে যেতে সাড়ে ছয় মাস সময় লেগে যেত। এ ছাড়া রোগ প্রশমন ও দমনের ব্যবস্থা ৫০ দিনের কম সময়ের জন্য বাস্তবায়ন করা হলে সংক্রমণের সংখ্যা অনেক বেড়ে যেত, এমনকি রোগীর সংখ্যা আইসিইউ শয্যার চাহিদার চেয়ে বেড়ে যেত। আর শিথিলতার সময় ৩০ দিনের বেশি হলে একই পরিস্থিতি হতো।

আলোচনা

এই গাণিতিক মডেলভিত্তিক সমীক্ষায় আমরা ১৬টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির

দেশে পরিবর্তনশীল এনপিআইয়ের প্রভাব মূল্যায়ন করেছি। এই সমীক্ষায় আমরা বেশ কিছু আন্তসম্পর্কিত ফলাফল পেয়েছি। প্রথমত, ৫০ দিনের প্রশমন ব্যবস্থা (*R*-এর মান দাঁড়াত ০.৮) প্রয়োগের পর ৩০ দিনের শিথিলতার চক্রে সংক্রমণের হার কমলেও আইসিইউ শয্যার চাহিদা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। দ্বিতীয়ত, আইসিইউ শয্যার চাহিদা সক্ষমতার বাইরে যেতে না দিতে সব দেশেই ৫০ দিনের রোগ দমন ও ৩০ দিনের শিথিলতার প্রয়োজন হবে (*R*-এর মান দাঁড়াত ০.৫)। অন্যদিকে এই রোগ দমনের 'ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ১৮ মাস বজায় রাখা গেলে নতুন সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার অনেকটাই কমানো যেত, চিকিৎসা বা টিকার সরবরাহ না আসা পর্যন্ত। শেষমেশ বলা যায়, বছরব্যাপী ধারাবাহিকভাবে রোগ দমন প্রক্রিয়া চালু রাখা গেলে সংক্রমণের হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা যেত। এটা কার্যকর বলেই বোধ হয়। তবে মানুষের জীবিকায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ত।

এই ফলাফলের নানাবিধ ব্যাখ্যা আছে। দেখা গেছে, নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে বয়স্ক মানুষের সংক্রমণের হার বেশি হলেও আইসিউ শয্যা ও হাসপাতালে ভর্তির হার কম। এর একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে এই সব দেশে এখনো তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি এবং মৃত্যু নিবন্ধন ব্যবস্থা এখনো সমন্বিত নয়। ফলে কে কোথায় কী কারণে মারা গেছে, তার সঠিক বিবরণ এসব দেশে নেই। তবে এই সব দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অসমতা এবং পরীক্ষা ও ক্রিটিক্যাল কেয়ারের যে স্বল্পতা, তাতে রোগ প্রশমনের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া না হলে বা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে মৃত্যুহার বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয়ত, আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছি, রোগ দমনের কঠোরতর ব্যবস্থা নেওয়া হলে আইসিইউ শয্যার চাহিদা ও মৃত্যু কমেছে—সব দেশের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। স্বাভাবিকভাবেই, রোগ নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হলে সামাজিক সংক্রমণের[২৪] হার হ্রাস পায়। কিন্তু নিম্ন আয়ের দেশগুলোর জন্য এটি এক উভয়সংকট নিয়ে হাজির হয়- রোগ নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে এই নিম্ন আয়ের মানুষের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে কি না। এ ক্ষেত্রে আমাদের পর্যবেক্ষণ হলো, দীর্ঘকালীন সামাজিক দূরত্বের চেয়ে পরিবর্তনশীল এনপিআই কৌশল গ্রহণ করা হলে পুরো ব্যাপারটা ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারে।

তৃতীয়ত, সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৫০ দিনের রোগ দমন চক্রের পর ৩০ দিনের শিথিলতা আরোপ করা হলে সব দেশেই মৃত্যুহার অনেকটা হ্রাস পাবে। এতে ১৮ মাসের কালচক্রে সংক্রমণের হার ও তীব্রতা উভয়ই হ্রাস পেত। উল্লেখ্য, এভাবে কড়াকড়ির পর শিথিলতা দেওয়া হলে সমাজ কিছুটা নিশ্বাস নিতে পারে। এই সম্ভাবনার কারণে সমাধান আরও টেকসই হতে পারে, বিশেষ করে গরিব দেশগুলোতে[২৫]। এখন কথা হলো, এসব ব্যবস্থার মেয়াদ কত দিন হবে, তা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট দেশের চাহিদা ও স্থানীয় সরকারব্যবস্থার ওপর, যাতে মানুষকে শুধু কোভিডের হাত থেকেই বাঁচানো

নয়, একই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও মানসিক সংকট থেকেও মুক্ত রাখা যায়। শেষমেশ বলা যায়, এর আগে যুক্তরাজ্য, কানাডা ও চীনে যেসব সমীক্ষা চালানো হয়েছে, তার সঙ্গে এই ফলাফল অনেকটাই মিলে যায়[৩, ২৫, ২৬]। এটি অন্যান্য দেশেও প্রয়োগ করা সম্ভব, তবে অঞ্চলভেদে মডেল ভিন্ন ভিন্ন হতে হবে।

দেশ	অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যা হতো			প্রশমন কৌশলের পর শিথিলতা চক্র			রোগ দমন কৌশল ও শিথিলতা চক্র		
	চূড়ান্ত সময়ে দৈনিক সংক্রমণ	চূড়ান্ত সময়ে আইসিইউ শয্যার চাহিদা	১৮ মাসে মোট মৃত্যু	চূড়ান্ত সময়ে দৈনিক সংক্রমণ	চূড়ান্ত সময়ে আইসিইউ শয্যার চাহিদা	১৮ মাসে মোট মৃত্যু	চূড়ান্ত সময়ে দৈনিক সংক্রমণ	চূড়ান্ত সময়ে আইসিইউ শয্যার চাহিদা	১৮ মাসে মোট মৃত্যু
অস্ট্রেলিয়া	১,৪৩৪,৬৩৮	৫৯,৮০৩	১৯৭,৭৪৬	৪১৮,৬৪৩	১৪,৭৯৮	৮৯,০৯১	৫৪,৭৪৮	১৭৩৪	১৯,৯৯৬
বেলজিয়াম	৬৫৭,৮৮৩	৩৩,২১৩	১০৯,৭৮৫	২৫৩,১৫০	১০,৬৭৪	৫১,১৫১	৬৩,১৩৫	২৪০৪	১৫,৮৪৬
চিলি	১,০৭৮,০৬১	৩৪,৮১৮	১১৫,০৬০	৩৫৭,৩১৬	৯৭১৬	৫৩,২১০	১৮,৩৫১	৪৫০	৭৫০৫
নেদারল্যান্ডস	৯৭৩,৭৭৯	৪৮,৭২৪	১৬১,১৪৭	৩৫৪,৩৭৩	১৪,৮৩১	৭৩,৩৮৩	৬৩,৪১২	২৩৯৫	১৯,৮১৯
কলম্বিয়া	২,৮৬২,০০০	৬৯,৮৭৮	২৩০,৬৮২	৯৮৮,৪৮১	২০,২২৫	১০৪,০৪০	৩০,৭৩০	৫৭০	৯২৩৯
মেক্সিকো	৭,২৫৩,৬৪২	১৫৪,৫০৭	৫০৯,৭৯৪	২,০৮২,৩০৮	৩৭,৫৯৮	২২৮,৮৭৯	৫৩,৩০৮	৮৬৩	১২,০৪৭
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩,৩২৯,৭৭৩	৫২,৪২১	১৭২,৪১৬	১,১৮৯,৭৩৯	১৫,৬৭৪	৭৯,০৯১	৪৪,৩৭৭	৫৩১	৯০৯৪
শ্রীলঙ্কা	১,২১২,৬১৩	৩৪,৩৩৫	১১৩,৪৬৯	২৮২,৮১৩	৬৮৭৬	৫১,৪৮৯	৭৮৭৫	১৭০	২০৩৯
বাংলাদেশ	৯,২৭০,১৭০	১৫০,৫০৩	৪৯৫,৪২০	২,৪২৭,২০৪	৩৩,৬৩১	২২৬,৭০০	৩৬,৫৯৭	৪৫২	৪৯০৮
ভারত	৭৭,৬৯৮,৭৭১	১,৪১৪,৩৮৪	৪,৬৬০,০১৩	২৬,১৮৫,৩৭৫	৩৯৯,৯৮২	২,০৯৩,৮৯৩	৮৭,৫৫৮	১২১১	১৫,৩৭৯
নাইজেরিয়া	১১,৪২৬,৯৭৩	৯৭,৪১১	৩১৯,৫৯৮	২,৯৯৪,৫৭৫	২১,৪২৪	১৪৪,০৪৯	৭৮৯৪	৫১	৬৫৯
পাকিস্তান	১২,৩১৬,৯২৫	১৫৯,৬৩৬	৫২৫,১৮৯	৩,৬৫৩,৬৮২	৪০,০৭২	২৩৫,৫২০	৮৬,০৮৪	৮৪৪	১১,২৬৪
আফগানিস্তান	২,১৬৩,০৮৮	১৭,৬৪০	৫৭,৮৫১	৫৫০,৬৬৯	৩৮৩৯	২৬,৪০১	৬৯৮৯	৪৩	৬১৪
বুরকিনা ফাসো	১,১৫৫,৪৭৯	৮৯১৮	২৯,২২৮	৩৮৮,৯০৯	২৫১৯	১৩,১৫৪	১১,৮৩৮	৬৯	১০৮০
তানজানিয়া	৩,২৯৭,৬৭৩	২৭,৩০৮	৮৯,৫৪৩	৮০৯,৩২৫	৫৭৪০	৪০,৭৫৫	১৬,৬৫৩	১০৫	৯০৫
উগান্ডা	২,৫১৬,৭৮৮	১৬,৩৫০	৫৩,৫০৩	৮০৪,০৭৯	৪৩৯৭	২৩,৯৮৭	২০,০৯৫	৯৯	১২৪৯

এই সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা ও কার্যকারিতা সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করতে হবে। প্রথমত, পৃথিবীজুড়ে এ রকম কঠোরতা কয়েক মাসব্যাপী বজায় রাখতে হবে। আমরা পরিবর্তনশীল এনপিআইয়ের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখেছি, নিয়মিত বিরতিতে তা আরোপ ও প্রত্যাহার করা হলে কী হতে পারে, তা নিরূপণের চেষ্টা করেছি। ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি ও তীব্রতার সঙ্গে এটি সম্পর্কহীন বলে দেখা গেছে[৪]। দ্বিতীয়ত, এই এনপিআই কেবল মহামারির চক্র ভোঁতা করে দেয়। এতে হার্ড ইমিউনিটি বা গণ-রোগ প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে উঠতে সময় বেশি লাগে। আবার এসব ব্যবস্থা একেবারে তুলে নেওয়া হলে দ্বিতীয় সংক্রমণ ঘটতে পারে, এমনকি তা আগের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র হতে পারে[২৭]। সে জন্য সুনির্দিষ্ট তথ্য ও দেশভিত্তিক বিশদ উপাত্তের অভাবে আমাদের সমীক্ষায় যেটা হচ্ছে তা হলো, বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থার একটা তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। এতে একটা ধারণা পাওয়া যায়, কখন ও কত দিনের জন্য এটা তুলে নেওয়া যাবে। তৃতীয়ত, আমরা রোগ সংক্রমণের সবচেয়ে আধুনিক মানদণ্ড-ব্যবহার করে এই পরিবর্তনশীল মডেল প্রণয়ন করেছি[৪, ১৭, ১৮, ২০]। আর তার ভিত্তি হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত এসইআইআর মডেল। সংক্রামক রোগের মহামারিতে এটি বহুল ব্যবহৃত। চতুর্থত, একেক ব্যবস্থার ফলাফল একেক দেশে একেক রকম হবে, সে জন্য আমরা মূলত ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি বা R-এর মান হ্রাসে নজর দিয়েছি। পঞ্চমত, বিভিন্ন দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা হাসপাতালে ভর্তির বয়সভিত্তিক হিসাব এবং সংক্রমণে মৃত্যুহার বিবেচনা করেছি। শুধু তা-ই নয়, একই সঙ্গে আয়ের নিরিখে দেশগুলোকে ভাগ করা হয়েছে। শেষমেশ, আমরা যেটা করেছি সেটা হলো, সংক্রমণের উত্থান ও পতনের সময়চক্র হিসাব করা। এ ক্ষেত্রে টানা ৫০ দিন হস্তক্ষেপের পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয়েছে। এরপর পরবর্তী চক্রে প্রবেশের আগে ৩০ দিনের বিরতি আদর্শ বিবেচনা করা হয়েছে। তবে প্রতিটি দেশের পরিস্থিতি ও সম্পদের ওপর পরিস্থিতি নির্ভর করেছে। এই পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট প্রাক্-মৃত্যুহারের বিবেচনায় উন্নত দেশে যেমন মডেলিং করা সম্ভব হয়েছিল, অনুন্নত দেশে সেটা করা সম্ভব নয়। এর কারণ হিসেবে কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করা যায় : ১. অনুন্নত দেশের অপ্রতুল স্বাস্থ্যব্যবস্থা, যেখানে সব নতুন ঘটনা সমন্বিতভাবে আমলে নেওয়া সম্ভব নয়; ২. তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্যের কারণে যে পর্যায়ে মৃত্যুহারের লক্ষ্য পূরণ হতে হতে সংক্রমিতের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে।

এদিকে এই সমীক্ষার বেশ কিছু গুরুতর সীমাবদ্ধতা আছে। মহামারির সুনির্দিষ্ট, দেশভিত্তিক ও তাৎক্ষণিক তথ্য-উপাত্তের অভাবে আমরা মডেলের কালপর্বে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির হার অপরিবর্তনীয় ধরে নিয়েছি। সম্ভবত, এটা নির্ভর করবে জনগোষ্ঠীর এনপিআই মান্য করা এবং অন্যান্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তার ওপর। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা R-এর মান যে ০.৮ ও ০.৫ ধরে নিয়েছি, তা দিয়ে সংক্রমণের দুটি ধারা বোঝা যায়, অর্থাৎ একটিতে বোঝা যায় যে সংক্রমণের হার শক্তিশালী,

আরেকটিতে বোঝা যায়, তা দুর্বল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এসব মেনে চলার প্রবণতা হ্রাস পায়। সে জন্য আমরা ধরে নিয়েছি, প্রতিটি দেশ নিজের মতো করে অতিরিক্ত নানা ব্যবস্থা নিয়ে এই নিয়ম না মানার ক্ষতিকর প্রভাব কাটাতে পারবে। বয়সভিত্তিক এই বিশ্লেষণ সরকারি খাতের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে করা হয়েছে। কিন্তু নিম্ন-মধ্যম ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোর এই সব তথ্য-উপাত্ত পাওয়া সহজ কর্ম নয়। যা পাওয়া যাবে, তা আবার কতটা যথাযথ, সেটা নিয়েও সন্দেহ আছে। সেই সব দেশে মৃত্যু ও সংক্রমণ হার কম দেখানোর প্রবণতা আছে। এ ছাড়া প্রাসঙ্গিক তথ্যের লভ্যতার অভাব থাকার কারণে এসব পরিবর্তনশীল ব্যবস্থার বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। এই পরিসংখ্যানের জন্য আরও সমীক্ষা প্রয়োজন হবে। পাশাপাশি পরিবেশ, দূষণ ও কাঠামোগত পরিসংখ্যান এসব ব্যবস্থায় আংশিকভাবে হলেও প্রভাব ফেলতে পারে। সে জন্য সব দেশে এক কৌশল খাটবে না। শেষমেশ বলতে হয়, সব ধরনের মডেলিংয়ের মতো আমাদের এই সমীক্ষা রোগ সংক্রমণের ধারণাভিত্তিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে করা হয়েছে। কথা হচ্ছে, সার্স কোভ-২-এর বিস্তার ও প্রাকৃতিক ইতিহাস নিয়ে যেহেতু অনিশ্চয়তা আছে, সেহেতু এক মাপে সবার জন্য জামা বানালে চলবে না, শরীরের মাপ অনুসারে সবার জন্য আলাদাভাবে বানাতে হবে।

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই সমীক্ষার তাৎপর্য আছে। প্রথমত, আমরা কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা এবং নীতি প্রণয়নবিষয়ক যা কিছু পেয়েছি, তা নিয়ে প্রতিবেদন করেছি। আমরা কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনায় বাস্তবায়নযোগ্য কৌশল প্রণয়ন করেছি। সে জন্য আমরা পরিবর্তনশীল কৌশল প্রণয়ন করেছি, যাতে সংক্রমণের চূড়ায় পৌঁছাতে সময় বেশি লাগে। এই সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্যব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিরোধক ও টিকা আবিষ্কার করা সম্ভব হতে পারে। আবার সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষতিবৃদ্ধি যাতে না হয়, সে জন্য যে রোগ দমনের ব্যবস্থার মাঝে বিরতি দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। তবে এসব কিছুই সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে, নির্দিষ্ট দেশের সামাজিক সুরক্ষা কেমন এবং সমাজ কতটা ঝুঁকির মুখে আছে, তা নিরূপণ করেই এসব করতে হবে। দ্বিতীয়ত, এই আবিষ্কার আবার নতুন গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে : ১. রোগের প্রাকৃতিক ইতিহাস নিয়ে আরও বিশদ সমীক্ষা করা, দেশে দেশে রোগীভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত নিয়ে এটি করা যেতে পারে[২৮], ২. বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে মহামারির গতি-প্রকৃতি নিয়ে সমীক্ষা হতে পারে, গ্রামে ও শহরে এবং কো-মরবিডিটি ও পুনঃ সংক্রমণবিষয়ক, ৩. জিনের ধরন[২৯], সামাজিক আচরণ[৩০] ও অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য নিয়ে টার্গেট মডেলিং।

এই বহুদেশভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় রোগ দমনের কঠোর ব্যবস্থার পর কিছুদিনের জন্য বিরতি দেওয়া যায়। সামাজিক দূরত্বের এই বিধান, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর জন্য কার্যকরী হবে। এসব দেশে টানা লকডাউন চালানো সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণেই কঠিন। নীতিগত দিক থেকে

তাই বলা যায়, রোগ দমনের পরিবর্তনশীল কৌশলের সুবিধা একাধিক : ১. মৃত্যু ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার প্রতিরোধ করা যায়, ২. চিকিৎসা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার জন্য সময় পাওয়া যায় এবং ৩. মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা লাঘব করা যায়।

তথ্যসূত্র

১. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. 2020. https ://www.who.int/emerg encie s/disea ses/novel -coron aviru s-2019/situa tion-repor ts. Accessed 15 April 2020.

২. The Worldometer. COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC. 2020. https ://www.world omete rs.info/coron aviru s/. Accessed 15 April 2020.

৩. Walker PG, Whittaker C, Watson O, et al. The global impact of COVID-19 and strategies for mitigation and suppression. London : WHO Collaborating Centre for Infectious Disease Modelling, MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis, Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics, Imperial College London; 2020.

৪. Ferguson NM, Laydon D, Nedjati-Gilani G, et al. Impact of nonpharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand. London : WHO Collaborating Centre for Infectious Disease Modelling MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics Imperial College London; 2020.

৫. Ainslie KEC, Walters C, Fu H, et al. Evidence of initial success for China exiting COVID-19 social distancing policy after achieving containment. London : WHO Collaborating Centre for Infectious Disease Modelling MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics Imperial College London; 2020.

৬. Ahmed F, Zviedrite N, Uzicanin A. Effectiveness of workplace social distancing measures in reducing influenza transmission : a systematic review. BMC Public Health. 2018;18(1) :518.

৭. Prem K, Liu Y, Russell TW, et al. The effect of control strategies to reduce social mixing on outcomes of the COVID-19 epidemic in Wuhan, China : a modelling study. The Lancet Public Health. 2020;5 :e261-70

৮. Lora Jones DB, Palumbo D. Coronavirus : a visual guide to the economic impact. BBC News; 2020.

৯. United Nations. Inter-agency task force on financing for development, financing for sustainable development report 2020. New York : United Nations; 2020.

১০. JAMA Network Learning. Coronavirus (COVID-19) Update : Vaccines and Immunity. In : Poland G, editor; 2020. https ://edhub.ama-assn.org/jn-learn ing/audio-player/18361 261. Accessed 15 April 2020.

১১. Checklist TRIPODTRIPOD : Prediction Model Development. 2020. https ://www.tripo d-state ment.org/. Accessed 15 April 2020.

১২. The World Bank. World Bank country and lending groups. https ://datah elpde sk.world bank.org/knowl edgeb ase/articles/906519-world -bank-count ry-and-lendi ng-group s. Accessed 30 Mar 2020.

১৩. Rothman KJ, Lash TSG. Modern Epidemiology. 3rd ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins; 2013.

১৪. Jarvis CI, Zandvoort Kv, Gimma A, et al. Impact of physical distance measures on transmission in the UK. CMMID Repository 2020.

১৫. Flaxman L et al. 2020. https ://www.imper ial.ac.uk/media/imperial-colle ge/medic ine/mrc-gida/2020-03-30-COVID 19-Report-13.pdf. Accessed May 1 2020

১৬. Blackwood JC, Childs LM. An introduction to compartmental modeling for the budding infectious disease modeler. Lett Biomath. 2018;5(1) :195-221.

১৭. Li Q, Guan X, Wu P, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. N Engl J Med. 2020;382(13) :1199-207.

১৮. Verity R, Okell LC, Dorigatti I, et al. Estimates of the severity of coronavirus disease 2019 : a model-based analysis. Lancet Infect Dis. https ://doi.org/10.1016/S1473 -3099(20)30243 -7.

১৯. Riou J, Althaus CL. Pattern of early human-to-human transmission of Wuhan 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), December 2019 to January 2020. Euro Surveill. 2020;25(4) :2000058.

২০. Riou J, Althaus CL. Pattern of early human-to-human transmission of Wuhan 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), December 2019 to January 2020. Eurosurveillance. 2020;25(4) :2000058.

২১. Oliphant TE. Python for scientific computing. Comput Sci Eng. 2007;9(3) :10-20.

২২. Hunter JD. Matplotlib : a 2D graphics environment. Comput Sci Eng. 2007;9(3) :90-5.

২৩. The World Bank. The World Bank Data : Hospital beds (per 1,000 people). 2020. https :// data.world bank.org/indic ator/SH.MED. BEDS.ZS. Accessed 30 Mar 2020.

২৪. Kissler SM, Tedijanto C, Goldstein E, Grad YH, Lipsitch M. Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period. Science. 2020; 2020 :eabb5793.

২৫. Tuite A, Fisman DN, Greer AL. Mathematical modeling of COVID-19 transmission and mitigation strategies in the population of Ontario, Canada. *medRxiv* 2020. https ://doi.org/10.1503/ cmaj.20047 6 .

২৬. Prem K, Liu Y, Russell TW, et al. The effect of control strategies to reduce social mixing on outcomes of the COVID-19 epidemic in Wuhan, China : a modelling study. Lancet Public Health.

২৭. Xu S, Li Y. Beware of the second wave of COVID-19. Lancet.2020;395(10233) : 1321-1322

২৮. Chang SL, Harding N, Zachreson C, Cliff M, Prokopenko O M.Modelling transmission and control of the COVID-19 pandemic in Australia. *arXiv* 2020; (2003.10218).

২৯. Bard J. Analysis of biological networks. J Anat. 2009;215(4) :473.

৩০. Marais BJ, Williams S, Li A, et al. Improving emergency preparedness and response in the Asia-Pacific. BMJ Glob Health.2019;4(1) :e001271.

নারীর প্রতি সহিংসতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আইরিন খান

ভূমিকা

করোনাভাইরাসের কারণে গৃহবন্দী মেয়েদের ওপর বেড়ে চলা সহিংসতাকে আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউএন উইমেন 'শ্যাডো প্যানডেমিক' বা ছায়া মহামারি বলে উল্লেখ করে। তাদের সমীক্ষা অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে প্রতি ৩ জনে ১ জন মেয়ে শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। এ ছাড়া রাস্তাঘাটে, পাড়ায় এবং বিভিন্ন জায়গায় নারী ও শিশুর ওপর বেড়েছে শারীরিক, যৌন নির্যাতনসহ অন্যান্য ধরনের নির্যাতন, যার মধ্যে আছে সাইবার বুলিং (ইউএন উইমেন)। নারীর ওপর সহিংসতা কেবল বাংলাদেশের একটি সমস্যা নয়, এটি একটি বৈশ্বিক মহামারিতে পরিণত হয়েছে। তবে ইউএন উইমেনের জেন্ডার অসমতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৯তম। যার অর্থ দাঁড়ায়, বৈশ্বিক এই সহিংসতা অনুশীলনে বাংলাদেশ দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের সমাজ নারীর প্রতি এত বিদ্বেষপূর্ণ হওয়ার কারণ কী?

নারীর প্রতি সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণ অনেকেই অনেকভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন। তার মধ্য থেকে উঠে আসা কারণগুলো হলো পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন, শিক্ষার অভাব, চলাচল ও সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতা, বিষাক্ত পুরুষত্ব, বাল্যবিবাহ, পুরুষের ওপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। এর সব কটি কারণই সংগত। এই লেখায় নতুন কোনো কারণের উল্লেখ করা হয়নি; বরং এই লেখায় এসব কারণের মূলে সভ্যতাকে দায়ী করে ফ্রয়েডের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—কীভাবে সভ্যতা সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং মানুষ কীভাবে সেই বিভাজনের শিকার হয়ে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে?

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের জনক ও স্নায়ু বিশেষজ্ঞ সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হলো সুখ অনুভব করা। মানুষকে সেই সুখ লাভ থেকে বিরত রাখে

সভ্যতা। ১৯২৯ সালে ফ্রয়েড জার্মান ভাষায় একটি বই লেখেন, নাম *Das Unbehagen in der Kultur*। এর ইংরেজি অনুবাদ করা হয় Civilization and its Discontent। এখানে জার্মান Kultur শব্দটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি—দুটো অর্থই প্রকাশ করে। তবে এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রে Kultur শব্দটিকে সভ্যতা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ফ্রয়েডের বই *Das Unbehagen in der Kultur*-এর বাংলা হতে পারে 'সভ্যতা ও তার অসন্তুষ্টি' যেখানে Kultur অর্থে সভ্যতাকে বোঝানো হচ্ছে, যার একটি অনবদ্য অংশ হলো সংস্কৃতি।

ফ্রয়েড *সিভিলাইজেশন অ্যান্ড ইটস ডিসকনটেন্ট* বইয়ে সভ্যতার নেতিবাচক দিকটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ফ্রয়েডের মতে মানুষের সব মানসিক যন্ত্রণার উৎস হলো তার অপরাধবোধ। এই অপরাধ বোধ যখন মানুষের মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন প্রতিক্রিয়া হিসেবে মানুষ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। *সিভিলাইজেশন অ্যান্ড ইটস ডিসকনটেন্ট* বইয়ে সভ্যতার প্রভাবে মানুষ কীভাবে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে, তা বর্ণনা করতে গিয়ে ফ্রয়েড উল্লেখ করেছেন মানুষের মাঝে এক 'মহাসামুদ্রিক অনুভূতি'র কথা। এটি এমন এক ব্যক্তিগত অনুভূতি, যা কোনো বিশ্বাস নয়, একধরনের সীমাহীন, অদম্য, বহমান অনুভূতি; নিজের সঙ্গে চারপাশের প্রকৃতির সংযোগের এক অনুভূতি। যখন মানুষ নিজের সত্তাকে অনুভব করে, সে তখন নিজেকে বুঝতে চায় তার পরিপার্শ্বের বিপরীতে রেখে। তার চারপাশের প্রতিটি বস্তু বা অবজেক্টের সঙ্গে তার যখন যোগাযোগ বিনিময় হয়, তখন তার মধ্যে তৈরি হয় এক অনুভূতি, যা প্রত্যেক মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ফ্রয়েড এই অনুভূতিকে বলছেন 'ইড'। ইড ভুল-শুদ্ধের বিচার জানে না, সঠিক-বেঠিক বোঝে না। সে এমন সব অনুভূতির উদ্রেক করতে পারে, যা সমাজের জন্য প্রযোজ্য নয় বা অপরের জন্য ক্ষতিকর। মানুষকে সমাজের উপযোগী করে তোলার শিক্ষা যেখানে থাকে, তাকে ফ্রয়েড বলছেন সুপার-ইগো। মানুষের প্রবৃত্তির কাজ হলো চাহিদার জানান দেওয়া আর সুপার-ইগো সিদ্ধান্ত দেয় কী করা যাবে, কী করা যাবে না। আর এর মাঝে অবস্থান করছে ইগো। ইগোর কাজ হলো ইড এবং সুপার-ইগোর মাঝে সমন্বয় ঘটানো। (এই লেখায় আমি ইড, ইগো এবং সুপার-ইগো ইংরেজি শব্দগুলোর বাংলা অনুবাদ ব্যবহার করছি না। ফ্রয়েডের ব্যবহার করা বিভিন্ন পরিভাষার বাংলা অনুবাদ নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে। শব্দগুলোর অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।)

সভ্যতার শিক্ষা নিয়ে সমাজ মানুষকে শেখায় তার কার সঙ্গে কেমন সম্পর্ক হতে পারে, আর কার কার সঙ্গে কেমন সম্পর্ক হতে পারে না। তখন মানুষ তার সেই তাড়নাকে অন্য কাজে, কোনো সৃজনশীল সৃষ্টি বা কোনো চিন্তা বা কর্মে রূপান্তর করে। এই লেখার উদ্দেশ্য হলো সমাজে যারা প্রতিনিয়ত নারীদের ওপর

সহিংস আচরণ করে যাচ্ছে, তাদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা, যেই ধরনের চিন্তা বা মানসিকতা মানুষকে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ করে, তার উৎস খুঁজে বের করা। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কথা উঠলে ফ্রয়েডকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। তাই ফ্রয়েডের ধারণা নিয়ে বিরোধ থাকলেও আমি তাঁর মতবাদের আলোকে আমাদের সমাজের সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা করেছি। আমি মনে করি, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ফ্রয়েড যেই পরিসরে কাজ করেছেন এবং স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা বর্তমান সমাজের সহিংসতার কারণ বিশ্লেষণে যথাযথ। লেখাটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে বর্ণনা করা হয়েছে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার বর্তমান রূপ। দ্বিতীয় অংশে ফ্রয়েডের মতবাদের আলোকে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে এই সমস্যা থেকে সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১

২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর—এই দশ মাসে বাংলাদেশে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১ হাজার ৩৪৯টি। এগুলোর মধ্যে ৪৬ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ১৩ জন আত্মহত্যা করেছে এবং আরও ২৭১ জনের ওপর ধর্ষণের চেষ্টা চালানো হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে নেওয়া এই তথ্য বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত। এর বাইরে রিপোর্ট করা হয়নি এমন অনেক ঘটনা থাকতে পারে, সেটা ধরে নেওয়াটা যুক্তিসংগত। কারণ, পত্রিকায় দৈনন্দিন জীবনের খুব উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা স্থান পায়। একইভাবে দৈনন্দিন জীবনের সব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পুলিশের কাছে যায় না বা জনসমক্ষে আসে না। সেসব ছাড়াই প্রতি মাসে গড়ে ১৩৫ জন নারীর ধর্ষণের খবর পত্রিকায় প্রকাশ পাচ্ছে। অর্থাৎ পত্রিকায় প্রতিদিন গড়ে ৪.৫টি ধর্ষণের ঘটনা ছাপা হয়। বিবাহিত সম্পর্কের মাঝে যে ধর্ষণ হয়, সেগুলো বাংলাদেশের আইন এখনো ধর্ষণ বলে গণ্য করে না। নারীর ওপর অন্য সব ধরনের নির্যাতনের তথ্যগুলোও এখানে অনুপস্থিত। কেবল ধর্ষণের ঘটনা দিনে ৪.৫টি এবং কেবল পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে এই সমীক্ষা। তবে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক মনে করেন, ধর্ষণের ঘটনা আসলে বাড়ছে না। বেশি সামনে আসছে। (তথ্যসূত্র : *প্রথম আলো*, ১৮ আগস্ট ২০২০।)

দেশে নারীর প্রতি সহিংসতার সার্বিক পরিস্থিতি বোঝার জন্য আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তৈরি নিম্নোক্ত ছকটি উল্লেখযোগ্য। বিগত ১০ মাসে যেই ১ হাজার ৩৪৯টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর মধ্যে ৬৬৩টি ঘটনায় ভুক্তভোগীর বয়স জানা যায়নি। বাকি যাদের বয়সের তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাদের মধ্যে ৯৬টি ধর্ষণ ও ২টি গণধর্ষণের শিকার হয় ৬ বছর বা তার থেকে কম বয়সের শিশুরা, ১৭৮টি

ধর্ষণ ও ১২টি গণধর্ষণের শিকার হয় ৭-১২ বছরের শিশুরা এবং ১৮৯টি ধর্ষণ ও ৬৫টি গণধর্ষণের শিকার ১৩-১৮ বছরের শিশুরা।

এ ছাড়া বিগত ১০ মাসে ২০৫ জন নারী খুন হয়েছেন তাঁদের স্বামীর হাতে। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে ২০.৫ জন নারীকে তাঁর স্বামী খুন করেছেন[১]। ৪৮৫টি শিশু খুন হয়েছে, তার মধ্যে ১১৪টি অর্থাৎ ২৩.৫% ৬ বছরের নিচে এবং ৯৬ জন ৭-১২ বছরের মধ্যে।

সিলেটে মুরারিচাঁদ (এমসি) কলেজে স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া তরুণীকে কলেজের কিছু ছাত্র যাঁরা ছাত্রলীগের সদস্য, মেয়েটির স্বামীকে বেঁধে রেখে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করেন। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে এক নারীকে বিবস্ত্র করে নির্মমভাবে নির্যাতন ও ধর্ষণের ভিডিও ধারণ করে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছাড়া হয়। ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ এবং নৃশংসতার ঘটনার পরে দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখা দেয়। ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের দাবি নিয়ে হাজার হাজার নারী রাস্তায় অবস্থান নেন। আইনের সংশোধন করে তা কার্যকর করা হয়। তবে দেখা যাচ্ছে, ধর্ষণ রোধে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান মৃত্যুদণ্ড করার পরেও ধর্ষণের ঘটনা কমেনি; বরং আইন সংশোধনের পরের মাসেই ধর্ষণের ঘটনা ৫৪% বেড়েছে। *প্রথম আলো* পত্রিকায় ১৮ নভেম্বর ২০২০ প্রকাশিত ‘সাজা বেড়েছে, ধর্ষণ কমেনি’ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে এক মাসে হঠাৎ করেই বেড়ে যাওয়া ধর্ষণের সংখ্যার মধ্যে ৬৪% ভুক্তভোগী হলো শিশু। একই প্রতিবেদনে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য জানানো হয়েছে, যা বাংলাদেশের সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি বুঝতে প্রয়োজন।

তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে, শ্রমঘন এলাকায় ধর্ষণের ঘটনা বেশি হচ্ছে। আইন সংশোধনের পরের মাসে আসামি করা হয়েছে অন্তত আড়াই শ জনকে। আসামিদের ৬৯% ৩০ বছর বয়সের নিচে। আসামিরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ষণের শিকার ভুক্তভোগীদের পরিচিত-প্রতিবেশী, আত্মীয়, প্রেমিক, প্রাইভেট টিউটর, স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক। অর্থাৎ পরিচিত মানুষের দ্বারাই সমাজের নারী ও শিশুরা প্রতিদিন ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। পরিচিত মানুষই নারী ও শিশুর জন্য সবচেয়ে অনিরাপদ হয়ে উঠছে। একদিকে আইনমন্ত্রী বলছেন শিশুদের ধর্ষণের খবর শুনে ওনার ‘খটকা’ লাগে, অন্যদিকে বিরোধীদলীয় সাংসদ সংসদে বলেন, তিনি মনে করেন, নারী উন্নয়নের নামে মেয়েরা ঘরের বাইরে কাজ করার দরুন মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আসে, ফলে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে (তথ্যসূত্র : *প্রথম আলো*, ১৮ আগস্ট ২০২০। ২য় পৃষ্ঠা)। দেশের জনপ্রতিনিধিরা যখন নারীদের অজ্ঞ, অদক্ষ ও পশ্চাৎপদ রাখার পক্ষে সায় দিচ্ছেন, পুরুষদের নারীর প্রতি বৈষম্য ও হিংস্র আচরণকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তখনই দেখা যাচ্ছে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করার পরও ধর্ষণের ঘটনা ৫৪% বেড়ে যাচ্ছে।

এক দল শিকার হচ্ছে, এক দল শিকার করছে, আরেক দল শিকারিদের সুযোগ করে দিচ্ছে। ভুক্তভোগী দল প্রান্তিক থেকে আরও প্রান্তিক অবস্থানে চলে যাচ্ছে। নারীর প্রতি সহিংসতা ও অসমতা রোধে আইন এবং নীতিমালার দিক থেকে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, ১৯৯৭; পারিবারিক নির্যাতন আইন, ২০১০ ও নারী ও শিশু নির্যাতন আইন। জাতীয় বাজেটেও নারীর উন্নয়নের ওপর বরাদ্দ রাখা হয়, নারী উদ্যোক্তাদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার ওপর জোর দেওয়া হয়। ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করা হয়। তারপরও যখন নারীর প্রতি সহিংসতা এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং জনপ্রতিনিধিরা যখন তার পক্ষে কথা বলেন, তখন বলতেই হয়, তা রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করার মতো এক ধৃষ্টতা, আইনকে অবজ্ঞা করে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার এক দাম্ভিকতা।

পরিচিত পুরুষই পরিচিত নারী ও শিশুর ক্ষতি করছে। ধর্ষণের চিত্র গ্রহণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছেড়ে দিচ্ছে মেয়েটিকে অপমান করার ভাবনা থেকে। অথচ অপরাধ যে করছে, সে মনে করছে না তার কর্ম তাকে সামাজিকভাবে হেয় করবে। সে ভাবছে, তার কর্মে মেয়েটা সমাজে অপমানিত হবে এবং তাই হচ্ছে। ধর্ষকের সঙ্গে ভুক্তভোগীর বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নারীকে খুন করছে বা আত্মহত্যা করতে বাধ্য করছে। পুলিশের কাছে সমস্যা নিয়ে গেলে মামলা নেওয়া হচ্ছে না। মামলা করা হলে চাপ দেওয়া হয় মামলা তুলে নেওয়ার জন্য। নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়।

সমাজে একদিকে মেয়েদের ওপর নির্যাতন ও বৈষম্য বাড়ছে, অন্যদিকে মহামারির কারণে মেয়েদের শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কর্মসংস্থান কমে যাচ্ছে, বাল্যবিবাহ বেড়ে যাচ্ছে। তাতে মেয়েরা আরও নির্ভরশীল ও দুর্বল হয়ে পড়ছে সামাজিকভাবে। সহিংসতা থেকে বের হয়ে আসার রাস্তা বন্ধ হয়ে আসছে। বিদ্যালয়গুলো কেবল মেয়েদের শিক্ষা দেয় না। শিশুরা সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও মনস্তাত্ত্বিক নানান শিক্ষা পেয়ে থাকে বিদ্যালয় থেকে। কিন্তু করোনাকালীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ। ১৪ বছরের শিশুর ৩৫ বছরের স্বামীর সঙ্গে বিবাহের পর লাগাতার ধর্ষণের ফলে মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটছে এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও। এখনো এই দেশের মেয়েরা বাড়িতে, রাস্তায়, স্কুলে, খেলার মাঠে, গণপরিবহনে, কর্মক্ষেত্রে কোথাও নিরাপদ নয়। যখন যখনই মেয়েদের ওপর হামলা হয়, তখন তখনই কথা ওঠে, সেই মেয়ে বাড়ির বাইরে কী করছিল? সেই মেয়ের পরনে কী ছিল? সমাজের এসব প্রশ্নের চড়া আওয়াজে ভুক্তভোগীর কথা হারিয়ে যায়। সব দৃষ্টি আর অঙ্গুলি তার দিকে ধেয়ে আসে বলে সে পালিয়ে বাঁচতে ধর্ষককেই বিয়ে করে ফেলে। এভাবে নির্যাতক বারবার ক্ষমা পেতে পেতে এখন সমাজ নির্যাতকের

কর্মকেই জায়েজ করে দিয়েছে, ‘ছেলেরা তো এমনই হয়’ বলে। আর ছেলেরা যেহেতু একটু ‘নির্যাতক প্রকৃতির’ হয়, তাই মেয়েদের কাপড়ের স্তরে, ঘরের চার দেয়ালে, অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে থাকতে হবে। এই নিয়ম অমান্য করলে শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের দায় নারীকেই নিতে হবে। মেয়েদের প্রতি এমন বৈষম্যমূলক আচরণে সমাজ পুরুষদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে না দুটি কারণে। এক. রাষ্ট্র পরিচালিত হয় পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, এমনকি দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় নারী বসলেও। সভ্যতা বা ইতিহাসের গল্পে যাদের উল্লেখ আছে ‘নরগোষ্ঠী’ হিসেবে। এই নরগোষ্ঠী মনে করে, ছেলেরা মেয়েদের দেখলে যৌন তাড়না অনুভব করবে। সে আক্রমণাত্মক হতেই পারে, তাই মেয়েদের দায়িত্ব নিজেদেরকে ছেলেদের দৃষ্টির অগোচরে রাখা। আর দ্বিতীয় কারণ প্রথম কারণের ফল। রাষ্ট্র তার কাজ আদায়ের জন্য এই ‘নরগোষ্ঠী’র ওপর নির্ভরশীল। শত শত বছর ধরে এই নরগোষ্ঠী নারীদের ঘরে বন্দী রাখতে সক্ষম হয়েছে। ফলে তাদের বাইরের কাজ করার দক্ষতা বা সক্ষমতা তৈরি হয়নি। আবার দক্ষতা থাকলেও তা অনুশীলন বা প্রদর্শন করার সুযোগ হয়নি। তাই রাষ্ট্র তার কাজের জন্য মূলত ‘নরগোষ্ঠী’র মুখাপেক্ষী। এই বিশাল সংঘবদ্ধ নরগোষ্ঠী একত্রে অবস্থান নিয়ে আছে নারী সমতায়নের গোড়ায়। তারা কিছুতেই নারীকে তাদের সম বলে মানতে চায় না। তারা নারীকে তাদের অধস্তন রাখতে, দুর্বল ও অদক্ষ প্রমাণ করতে অনেক সময় আগ্রাসী হয়ে ওঠে।

এই ভাবনার পেছনেও দুটি কারণ বলা যায়। এক. সভ্যতার শিক্ষা যা তাকে শিখিয়েছে নারীকে নানানভাবে কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা। এই শিক্ষায় দীক্ষা লাভকারী কেবল পুরুষ নয়, অনেক নারীও আছে। আর দুই. পুরুষের প্রবৃত্তির তাড়না। ফ্রয়েড বিশদভাবে এই দ্বিতীয় কারণটি ব্যাখ্যা করেছেন। পুরুষের সব তাড়না তার যৌন তাড়না দ্বারা পরিচালিত। এই সুখ লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকেই অন্য সব চাহিদার উদ্রেক হয়। ফ্রয়েড নারীর ওপর পুরুষের এমন নির্ভরশীলতাকে বিপজ্জনক বলে মনে করেন। কারণ, সুখ লাভের এই উৎসকে পুরুষ সব উপায়ে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করবে। যখনই মেয়েরা তাদের ধার্য করা গণ্ডির বাইরে কিছু করে, কিছু উদ্যত পুরুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে সহিংসতার আশ্রয় নেয়। নারীর কষ্টের থেকেও পুরুষের তার নিজের সুখ বেশি প্রাধান্য পায়। একে স্বার্থপরতা বলে। স্বার্থপরতা হলো উদারতার বিপরীত। আর ফ্রয়েড বলেন, ভালোবাসা হলো উদারতার অনুশীলন। সবাই নিজেকে ভালো ও উদার বলে জানাতে চায়। মানুষ সুখের অভাব থেকে স্বার্থপর হয়। তার থেকে তৈরি হয় অপরাধবোধ। পুরুষ তার এই অপরাধবোধ থেকে বাঁচার জন্য আবার ফিরে আসে সেই সভ্যতার শিক্ষার কাছে। তাতে সে তার স্বার্থপরতার দায়ভার চাপিয়ে দেয় নারীর ওপর। নারী যদি

তার বলয়ের বাইরে বের না হয়, নারী যদি তার নিজের সুখ ত্যাগ করে, পুরুষের আধিপত্য মেনে নেয়, তাহলে তার এই নিরাপত্তাহীনতা বোধ তৈরি হয় না, আর তাকে আগ্রাসী হতে হয় না। এমন একটা সমাধান নিয়ে 'নরগোষ্ঠী' মেয়েদের অবদমিত করে আসছে শতকের পর শতক ধরে। বলা হয় ধর্ষণ যৌন তাড়না থেকে হয় না, ক্ষমতার প্রকাশের জন্য হয়। ক্ষমতার প্রকাশটা এভাবেই। সুযোগ পেলেই মেয়েদের দেখিয়ে দিতে চায় 'নরগোষ্ঠী'র ক্ষমতা। এভাবে এমন এক নির্লজ্জ সমাজ তৈরি হয়েছে, যেখানে ধর্ষণের বিচার চাইতে আন্দোলন করতে হয়। নারীর সম-অবস্থানের সম্মান চাওয়ার জন্য লাঞ্ছিত হতে হয়। পরনে কী ছিল, তাতেই যদি সমস্যা হতো, তবে ৮ মাসের, ৩ বছরের, ১০ বছরের শিশু, ছেলেশিশু, মেয়েশিশু ধর্ষণের ঘটনা কেন এত বেশি? কোথায় আমাদের ভুল হচ্ছে? আমরা সমস্যার গোড়ায় কেন পৌঁছাতে পারছি না?

২

রুশো, নিৎশে, ফ্রয়েড, কেরকেগার্ড প্রমুখ অনেক দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী সভ্যতাকে বস্তুগত সাফল্য ও সামাজিক অস্পষ্টতা, হিংসা ও লোভের উৎস বলে মনে করেন। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের জনক ও স্নায়ু বিশেষজ্ঞ সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হলো সুখ অনুভব করা। মানুষকে সেই সুখ লাভ থেকে বিরত রাখে সভ্যতা, তার নানান রকমের নিয়ম ও নীতির শিক্ষা দিয়ে। সভ্যতা কাকে বলে?

সভ্যতা হলো মানুষের সব উদ্ভাবন, আবিষ্কার ও জ্ঞানের সাফল্য। সভ্যতা গঠনে ভাষার ভূমিকা অনবদ্য। কারণ, ভাষার মাধ্যমেই আমরা আমাদের বিমূর্ত ভাবনাগুলো প্রকাশ করতে পারি। সভ্যতার প্রথম ধাপ হলো প্রকৃতিকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করা, নানান রকমের হাতিয়ার ব্যবহার করে প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান টেকানো, আগুনকে বশ করে অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার ও বাসস্থান তৈরি করে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে পরিবার ও সমাজ গঠন করা। তারপর মানুষ বশ করল গতিকে, আবিষ্কার করল বৈদ্যুতিক যন্ত্র। আবিষ্কৃত হলো চাকা, আবিষ্কৃত হলো ইঞ্জিন। উন্নত হলো যোগাযোগব্যবস্থা। কোনো দেশের সভ্যতা উচ্চ মানের ধরা হয়, যখন মানুষ প্রকৃতিকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে পারে। যেখানে নদীর পানি উপচে গিয়ে বন্যা হয়, সেখানে নদীকে শাসন করা, পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে খরা অঞ্চলে প্রবাহিত করা, যাতায়াতব্যবস্থা উন্নত, দ্রুত ও পর্যাপ্ত রাখা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। সমাজ হবে বন্য প্রাণীর আক্রমণমুক্ত। মানুষের খাদ্যের জোগান থাকবে নিশ্চিত। মাটি উর্বর করা হবে ভালো শস্য উৎপাদন করার জন্য। ভালো সভ্যতা হয়ে উঠতে হলে আরও একটা জরুরি বৈশিষ্ট্য হলো, প্রকৃতির অপ্রয়োজনীয় জিনিস ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় ও রুচিসম্মত শিল্পে পরিণত করা। যেমন প্রকৃতিতে প্রচুর ফুল

ফোটে, যা মানুষের তেমন কোনো কাজে আসে না। তবে সেই ফুল যখন বাড়ির আঙিনায় বা ফুলদানিতে থাকে, তখন তার সৌন্দর্য বাড়ির শোভা বাড়ায়। ভালো সভ্যতায় মানুষ হবে সৃজনশীল, নিজের হাত দিয়ে তৈরি করবে নানান শিল্প। ফ্রয়েড বলেন, সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা ও নিয়ম ভালো সভ্যতা হিসেবে গড়ে ওঠার কিছু মানদণ্ড। এরপর আসে সভ্যতার দার্শনিক মানদণ্ড, প্রত্যেক মানুষের মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ কেমন হওয়া উচিত তার বিধান।

সভ্যতার শিক্ষায় মানুষের আচরণ নির্ধারণ করতে দরকার গোষ্ঠীগত অনুশীলন। সে ক্ষেত্রে সভ্যতা নিজেদের আচরণকে পোক্ত করতে ব্যক্তিস্বার্থের বিরোধিতা করতে পারে, ব্যক্তির ওপর হিংস্র আচরণও করতে পারে। তখনই সভ্যতার মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা পূরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা চলে আসে। যেমন সভ্যতার পূর্বে মানুষের সম্পর্কের মাঝে নিষেধাজ্ঞা কম ছিল। ভাই-বোন বা মা-ছেলের মধ্যে থাকত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। খাবার তৈরির পদ্ধতিও ছিল ভিন্ন। সভ্যতা মানুষকে সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। মানুষকে শেখাল তার কী কী করা উচিত আর কী কী করা উচিত নয়। ফ্রয়েডের মতে, সভ্যতা তার শিক্ষা দিয়ে অনেক কিছু নাকচ করে দিল, যেসবের চাহিদা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিতাড়িত। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি কী? সহজাত প্রবৃত্তি হলো মানুষের ভুল-শুদ্ধ, সঠিক-বেঠিক বিবেচনার বাইরের চাহিদা। যা কোনো নিয়ম, নীতি, আইন, সঠিক-বেঠিক জানে না। ফ্রয়েড এই প্রবৃত্তির তাড়নাকে বলছেন ইড (id)। সভ্যতা মানুষের কিছু প্রবৃত্তিকে নিষিদ্ধ করলেও মানুষ সেসব প্রবৃত্তির তাড়না অনুভব করে। এই কারণে মানুষ সভ্যতার নিয়ম বা আইনবিরোধী নানান কাজ করে থাকে। সভ্যতার শিক্ষা মানুষের মধ্যে বিচার-বিবেচনা করার ক্ষমতা তৈরি করে। ফ্রয়েড একে বলছেন সুপার-ইগো (Super-ego)। মানুষ এই শিক্ষা পায় পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, গণমাধ্যম—এমন নানান প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। মানুষের ইডের কারণে যখন প্রবৃত্তির তাড়না তৈরি হয়, তখন তার সুপার-ইগো সেই চাহিদার বিচার করে তাকে সঠিক বা বেঠিক হিসেবে ভাগ করে। এই ইড আর সুপার-ইগোর মধ্যে অবস্থান করে ইগো, যা এই দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনে। এই সামঞ্জস্য কখনো সভ্যতার পক্ষে যায়, কখনো বিপক্ষে। তবে সভ্যতার নিষেধ করা কাজের তাড়না জাগলে মানুষের মধ্যে একধরনের অপরাধবোধ তৈরি হয়। তার মধ্যে যখন সভ্যতায় নিষিদ্ধ কোনো কাজের চাহিদা অনুভব হয়, তখন সে নিজেকে ভুল বা খারাপ বলে মনে করতে থাকে। তাতে তার নিজের ওপর রাগ বা ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং সে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। তবে মানুষ কখনো কখনো তার এই রাগ বা ঘৃণাকে প্রশমিত করতে পারে, অন্য কোনো পথে তার এই মানসিক প্রতিক্রিয়াকে ধাবিত করতে পারে। ফ্রয়েড একে বলছেন সাবলিমেশন (Sublimation)। ফ্রয়েড

মনে করেন, এই চেতনা বা প্রতিক্রিয়া অন্য কোনো সৃজনশীল পথে ধাবিত করা সহজ কাজ নয়। এটি উন্নত পর্যায়ের মানবতার কাজ, যা সবাই পারে না। অর্থাৎ মানুষের ইডে তৈরি হয় সভ্যতার নিষিদ্ধ কাজের তাড়না, মানুষের সুপার-ইগো তা বিবেচনা করে সঠিক-বেঠিক ভাগে ভাগ করে এবং ইগো মানুষের এই দ্বৈত সত্তার মধ্যে সামঞ্জস্য নিয়ে আসে। তখন তৈরি হয় বিবেক। এই বিবেক মানুষের মধ্যে অপরাধবোধের জন্ম দেয়।

মানুষের কাছ থেকে সভ্যতা যে ধরনের জীবন আশা করে, তা ধারণ করা মানুষের পক্ষে খুব কঠিন। সভ্যতা প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নানান সহজাত প্রবৃত্তিকেও নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। প্রবৃত্তির ওপর শক্ত নিয়ন্ত্রণ মানুষের মাঝে কষ্টের জন্ম দেয়। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হলো সুখে থাকা। মানুষ কীভাবে সুখে থাকে? মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ হলে মানুষ সুখে থাকে। প্রত্যেক মানুষ আলাদা স্বভাবের। মানুষের জিনগত বিন্যাস ও পরিপার্শ্বের নানান শিক্ষা তার বাহ্যিক ও মানসিক আচরণ, আগ্রহ ও দক্ষতা নির্ধারণ করে। মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদার সঙ্গে তার ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, চেহারা, পারিবারিক পরিচয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ সভ্যতা কী করে? সভ্যতা সমাজে বিভাজন এনে দেয় নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করে ধর্ম ও সংস্কৃতির পাঠ দিয়ে। সভ্যতা নিজের চরিত্র রচনার জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে, তা পালন করা হয় সমষ্টিগত অনুশীলনের মাধ্যমে। সভ্যতা নিজের ভাবমূর্তি পোক্ত করতে ব্যক্তিস্বার্থের বিরোধিতা করে, ব্যক্তির ওপর হিংস্র আচরণও করে। তখনই সভ্যতার মধ্যে থেকে মানুষ তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে না। ব্যক্তিগত সাফল্য সভ্যতার কাছে খুব একটা জরুরি নয়। ফ্রয়েড বলেন, সভ্যতার পূর্বে মানুষ নিজেদের আত্মতুষ্টিকে প্রাধান্য দিত। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা কমে যায়।

সভ্যতার বিকাশ মানে মানুষ সভ্যতার স্বার্থে কাজ করবে। সভ্যতা সমাজকে নানান ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগের জন্য নির্দিষ্ট কাজ ধার্য করে দেয় এবং তার প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সেসব শক্তভাবে পরিচালনা করে। সেভাবেই সভ্যতা সমাজে নারী-পুরুষের জন্য বিভিন্ন দায়িত্ব ধার্য করে রেখেছে এবং সেসব পালন করার জন্য তার প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়োজিত। গোষ্ঠী দ্বারা তার উদ্দেশ্য সফল করতে সভ্যতা নানান শাস্তির বিধানও করে থাকে। তাতে মানুষের ব্যক্তিসুখ খর্ব হয়। মানুষকে শেখানো হয় সভ্যতার জন্য কাজ করা তার জীবনের উদ্দেশ্য। সভ্যতার বশবর্তী হয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত তার নানান সুখের বিসর্জন দিতে থাকে। তাতে মানুষ সুখ লাভ করে না। তার মধ্যে কষ্ট তৈরি হয়। মানুষের সুখের অনুভূতিটা কেমন?

মানুষ দুভাবে সুখী হয়। এক. যখন তার জীবনে দুঃখ বা কষ্ট অনুপস্থিত থাকে এবং দুই. যখন সে আনন্দ বা তৃপ্তি অনুভব করে। প্রবৃত্তির সব চাহিদা পূরণ করা

সম্ভব নয়। তখন মানুষ কষ্ট অনুভব করে। কষ্ট কী? কষ্ট হলো সুখের অনুপস্থিতি। ফ্রয়েডের মতে কষ্ট তিন দিক থেকে আসে। এক. শারীরিক কষ্ট যা আসে কায়িক শ্রম, অসুখ বা মানসিক অশান্তি থেকে। দুই. নিজের শরীর ও মনস্তত্ত্বের বাইরে থেকে আসে, অন্যের কষ্টে কষ্ট অনুভব করা বা অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। তিন. পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে। ফ্রয়েডের মতে, কষ্টের এই তৃতীয় উৎস থেকেই মানুষ সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়। এই কষ্ট থেকে মানুষ কীভাবে রেহাই পেতে পারে? ফ্রয়েড বলেন, কষ্ট থেকে দূরে থাকা, চিকিৎসা সাহায্য গ্রহণ করা বা ওষুধ সেবন এমন নানান পন্থা আছে কষ্ট লাঘব করার। তবে তিনি বলেছেন সাবলিমেশনের (Sublimation) কথা (সাবলিমেশন বলতে ফ্রয়েড যা বুঝিয়েছেন, তা তুলে ধরার মতো যথার্থ বাংলা শব্দ খুঁজে না পাওয়ায় ইংরেজি শব্দটিই রেখে দেওয়া হয়েছে)।

কষ্টের উৎসগুলোর মধ্যে প্রথম দুটি কারণ মানুষ অনেকটা বাস্তবতার সঙ্গে মেনে নেয়। মানুষ মেনে নেয় শারীরিক প্রদাহ বা পরিপার্শ্বের ওপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তবে তৃতীয় যে কারণ, সম্পর্ক থেকে মানুষ যে কষ্ট পায়, তা সে মেনে নিতে পারে না। এই তৃতীয় কারণে কষ্ট পাওয়ার পেছনে ফ্রয়েড সভ্যতাকে দায়ী করেন। ফ্রয়েডের মতে, মূর্তিপূজার বিপরীতে খ্রিষ্টধর্মের জয় বর্তমান সভ্যতার চরিত্র রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পৃথিবীতে আদিবাসীদের জীবনধারণ ছিল খুবই সাধারণ ও সুখী, জীবনের চাহিদা ছিল কম এবং তারা মূলত তাদের প্রতিদিনের জীবনে প্রকৃতিকে সম্মান করে চলত। খ্রিষ্টধর্ম এসে মানুষের পৃথিবীর জীবনকে নগণ্য বলে স্বর্গীয় জীবনের মহত্ত্ব বোঝাল। মানুষকে একটা ইউটোপিয়ান বা অবাস্তব দুনিয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বলল, যার অবস্থান কেবল কল্পনায়। এর কোনো বাস্তবিক প্রতিরূপ নেই। ফলে মানুষের মধ্যে তৈরি হলো বিভ্রান্তি। এই বিভ্রান্তি দূর করতে মানুষ কিছু ধর্মগুরুর শরণাপন্ন হলো, যাঁরা বাতলাবেন মানুষের দৈনন্দিন জীবন, আচরণ, সম্পর্ক, কর্ম ও প্রতিক্রিয়া কেমন হবে। পৃথিবীর ইতিহাস যদিও খ্রিষ্টধর্মের আগে থেকে শুরু, তথাপিও বর্তমান সভ্যতার পেছনে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব অনেক। স্বর্গে আদমের (আ:) আপেল খাওয়ার দায়ভার ইভের ওপর ছেড়ে দেওয়া থেকে নিয়ে গড বা ঈশ্বরের যে পুরুষতান্ত্রিক চিত্র, তার মূলে পশ্চিমা সভ্যতার চিত্র ফুটে ওঠে। বিশ্বজুড়ে খ্রিষ্টধর্মের বিস্তার নারীবিদ্বেষী মনোভাব ছড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

সভ্যতা নিজের জন্য অনুসারী চায়, ফলে সভ্যতায় নারীর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। এই অনুসারী প্রয়োজন সভ্যতার চাকা গতিশীল রাখতে। সভ্যতার প্রয়োজন উন্নত জিনের নাগরিক, যে তার জন্য কাজ করে তার ভাবমূর্তি উচ্চতর করবে। এ ক্ষেত্রে সভ্যতা পুরুষ গোষ্ঠীকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কারণ, তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দরকার সৈনিক। সভ্যতার ওপর যেকোনো আক্রমণে পুরুষের

প্রয়োজন। যেকোনো সংঘর্ষে কিছু পুরুষ মারা গেলেও সভ্যতার জন্য সন্তান ধারণযোগ্য নারীর বিয়োগ বেশি ক্ষতিকর। কারণ, এক পুরুষ তার জীবনকালে অনেক সন্তান জন্মদানে অবদান রাখতে পারে, কিন্তু এক নারীর গর্ভে এক বছরে একটি সন্তান জন্ম লাভ করে, তা-ও আবার সীমিত সময়ের মধ্যে। সন্তানকে সুষ্ঠুভাবে বড় করতেও নারীর প্রয়োজন। এভাবে সভ্যতা তার স্বার্থে নারী ও পুরুষের কাজ ভাগ করে দিল। পুরুষকে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করাতে, সভ্যতার স্বার্থে জীবন দিতে অনুপ্রাণিত করার জন্য তাকে বলা হলো সে বেশি শক্তিশালী। যেভাবে বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় সেনাবাহিনীকে নানান সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দেশের স্বার্থে জীবন দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়, শহীদের মর্যাদাকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হয়। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়াকে উচ্চ মানের পুরুষত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। একইভাবে পুরুষকে সভ্যতা দিল সমাজের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান। তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবকিছুকে উদ্‌যাপন করার অনুশীলন চালু হলো। আর বাকি সবাইকে করা হলো পুরুষের অধস্তন।

নারী ও পুরুষের মিলন প্রকৃতি সহজাত। মানুষ হিসেবে প্রকৃতির এই অনবদ্য দুই শক্তি একে অপরের সান্নিধ্যে আসবে। সন্তান জন্মলাভের পর তার সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার জন্য লালন-পালন প্রয়োজন। এই লালন-পালন প্রক্রিয়া এমন হওয়া দরকার, যাতে মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে নিজের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে। একজন মানুষ প্রকৃতির অবদান, সে প্রকৃতিতে অবদান রাখে। প্রকৃতি বলতে পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে বোঝানো হচ্ছে। নিজের স্বাস্থ্য, মনন ও নিরাপত্তা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে প্রকৃতির জন্য মানুষের কাজ করার কথা। কিন্তু সভ্যতা যেহেতু প্রকৃতির ওপরে আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তার ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করে, তাই প্রকৃতির এই অবদান সে তার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। কিন্তু মানুষ স্বভাবতই তার প্রবৃত্তির তাড়না দ্বারা ধাবিত হবে, নারীর কাছে যাবে, প্রকৃতির কাছে যাবে, প্রকৃতির পক্ষে কাজ করবে। আর সভ্যতা চায় উল্টোটা। তাই সে তার বিধান দিয়ে মানুষকে তার এই সহজাত প্রবৃত্তি থেকে দূরে রাখে, তাকে নারীর থেকে আলাদা করে।

ফ্রয়েড তার *সিভিলাইজেশন অ্যান্ড ইটস ডিসকনটেন্ট* বইয়ে মহাসামুদ্রিক এক অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন। এটি মানুষের নিজের পরিপার্শ্বের সঙ্গে মিশে যাওয়ার এক তাড়না, যা সে তার মাঝে অনুভব করে। তার প্রকৃতি, পরিপার্শ্বের সঙ্গে এক হওয়ার বাসনা। এই বাসনা থেকে দূরে সরে গেলে মানুষ কষ্ট অনুভব করে। সভ্যতা তার বিধানের মাধ্যমে মানুষকে তার এই মহাসামুদ্রিক কিংবা মহাজাগতিক অনুভূতি থেকে আলাদা করে দেয়। যোদ্ধা তৈরি করতে রাষ্ট্র যেমন সন্তানকে তার মায়ের থেকে বঞ্চিত করে, তার স্বভাবজাত মিলনের সাথির কাছ থেকে দূরে রাখে, তেমনি সভ্যতাও নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। তাতে

পুরুষ ও নারী উভয়েরই তাদের মৌলিক প্রবৃত্তির কাছে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্র হতে থাকে। এই বিভাজন বজায় রাখতে ব্যবহার করে তার সব প্রতিষ্ঠান। উভয় নারী ও পুরুষকে জানায় নিয়মনীতির বাইরে তাদের একে অপরের সান্নিধ্যে আসা বেঠিক এবং তাদের ওপর নিজেদের রচনা করা দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়। তারা যখন আলাদা হয়ে কষ্ট অনুভব করে তখন কষ্ট থেকে যেন মানুষ আক্রমণাত্মক না হয়ে ওঠে, তাই তার প্রতিক্রিয়া অন্যদিকে ধাবিত করার চেষ্টা করা হয়। তাকে উন্নত মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে বলা হয় সাবলিমেশনের কথা। তাকে বলা হয়, সভ্যতার প্রতি তার দায়িত্ব পালনের মধ্যেই তার সুখ।

সাবলিমেশন অর্থাৎ প্রবৃত্তির তাড়না অন্যদিকে ধাবিত করার মাধ্যমে সভ্যতা মানুষকে দিয়ে নানান কাজ করিয়ে নেয়। মানুষের জ্ঞানের পরিসর যুগের সঙ্গে বেড়েছে, মানুষ দিগ্বিদিক জয় করেছে, বিজ্ঞান জন্ম ও সৃষ্টির প্রায় সবকিছুই ব্যাখ্যা করে ফেলেছে। প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে। তবে তার কোনো কিছুই মানুষের সুখী হওয়ার প্রবণতাকে তৃপ্ত করতে পারেনি; মানুষের আত্মতৃপ্তি বাড়ায়নি। এখন হাজার হাজার মাইল দূরে সন্তানের হাসির শব্দ আমরা ঘরে বসেই শুনতে পাই, বা কোনো বন্ধু বা পরিবারের সদস্যের দূর কোনো দেশে পৌঁছানোর খবর তৎক্ষণাৎ পেয়ে যাই, এই সবই মানুষকে খুশি করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদ্ভাবন যে প্রসূতি মাতা ও শিশুর মৃত্যুহার কমিয়েছে, তা উপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই। সে ক্ষেত্রে ফ্রয়েড বলেন, যদি রেললাইনই না থাকত মাইলের পর মাইল দূরত্বকে অতিক্রম করার জন্য, তবে বন্ধুর পৌঁছানোর বার্তার জন্য অপেক্ষা করতে হতো না, বন্ধুবিচ্ছেদের যন্ত্রণা থাকত না। শিশুর মৃত্যুহার কমিয়ে সুস্বাস্থ্যের নামে শিশুর জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। তাতে পূর্বের তুলনায় কম শিশুর জন্ম হচ্ছে। মানুষের আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে লাভটাই-বা কী, মানুষ যদি জীবনে সুখী হতে না পারে?

সাবলিমেশনের কথা বলে মানুষকে ভুলিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। মানুষ বারবার তার প্রবৃত্তির তাড়নায় সাড়া দিতে চায়। সভ্যতা তার নিয়ন্ত্রণ আরও শক্ত করে। ফ্রয়েড বলেছেন, মানুষ মূলত দুটি কারণে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে। ১. কাজের জন্য এবং ২. ভালোবাসার জন্য। ইরোস অ্যান্ড আনানকে (Eros and Ananke) অর্থাৎ ভালোবাসা ও প্রয়োজন হলো মানবসভ্যতার দুটি পূর্বশর্ত। নারী ও পুরুষ উভয়েই এই প্রয়োজন দ্বারা তাড়িত। কিন্তু সভ্যতা বিভাজন করছে, মানুষের মাঝে কষ্টের উদ্রেক হচ্ছে। এই কষ্টের বহিঃপ্রকাশ করার কোনো জায়গা সভ্যতা দেয় না। না পাওয়ার কষ্ট মানুষের মনে পাওয়ার তাড়নাকে আরও তীব্র করে। ফ্রয়েডের মতে, পুরুষ তার এই প্রবৃত্তির সর্বোচ্চ তাড়নাকে যৌন তাড়নার সঙ্গে এক করে ফেলে। সে তখন তার যৌন তাড়না পরিপূর্ণ হওয়ার মাঝে তার প্রবৃত্তির তাড়না পরিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখে। তাই তার প্রবৃত্তির তাড়না পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত তার যৌন

তাড়না দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে নারী সঙ্গীর ওপর পুরুষের সৃষ্টি হয় নির্ভরশীলতা। না পাওয়ার অতৃপ্ত বাসনা মানুষের মধ্যে এক নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করে।

ফলে পুরুষ তার নারী সঙ্গীকে সব সময় তার কাছে রাখতে চায়। এই আয়োজন পুরুষকে সুবিধাজনক অবস্থানে রাখে। কারণ, সে তার তৃপ্তির উৎসকে কাছে রাখছে, সন্তান বা ভবিষ্যৎ পরিবার সদস্য, যে তার কাজে তাকে সাহায্য করবে, তাকেও পাচ্ছে। তবে মানুষের জীবনের এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা তার অস্তিত্বের মূলে অবস্থান করছে, তার জন্য তাকে অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। এমন একটা মূল চাহিদা পূরণের উৎসের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা মানুষ অবশ্যই করবে, আর তাই ফ্রয়েড এই নির্ভরশীলতাকে বিপজ্জনক বলে মনে করেন।

সভ্যতা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার স্বার্থে মানুষের পারস্পরিক, বিশেষ করে যৌন সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে খুব শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। তবে এর প্রভাব ব্যক্তিসম্পর্কের ওপর যখন পড়ে, তখন শুরু হয় দ্বন্দ্ব। ব্যক্তিপর্যায়ে যে কেউ যে কারও প্রতি টান বা ভালোবাসা অনুভব করতে পারে। প্রত্যেকের ভালোবাসা তার কাছে জরুরি এবং সে চায় না সেটা কোনোভাবে বৃথা যাক। মানুষ যার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায়, তাকেই বেশি ভালোবাসে। ফ্রয়েড মনে করেন, মানুষ নিজের এক প্রতিকৃতি খুঁজে বেড়ায় অন্যের মাঝে। কখনো এই সাথি খুঁজে পায় বাবার বন্ধুর ছেলে বা পরিবার বা আত্মীয়ের মাঝে। তবে যখন এই পারস্পরিক সম্পর্ক লোকদেখানো হয় বা কোনো উপহার হিসেবে আসে বা ভালোবাসা ছাড়া অন্য যেকোনো উদ্দেশ্যে যখন অপরিচিত কারও সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আবদ্ধ হতে হয় কোনো রকমের আকর্ষণ ছাড়া, তখন তা হয়ে যায় অবিচার। যখন একটা নারী ও পুরুষ একে অপরকে সামাজিক উপহার হিসেবে লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে, তখন তারা একে অপরকে সম্মান করতে পারে না। এই সামাজিক সম্পর্ক যদি হয় পুরুষের অনুকূলে, তবে সে নারীর ক্ষতি বা তাকে অপমান করতে পিছপা হবে না। কারণ, তার কাছে তার বস্তুবাচক লাভে সুখ এবং সে তার সুখের উৎসকে নিরাপদ রাখতে চায়।

এ ছাড়া সভ্যতার বেঁধে দেওয়া কাজের তালিকাতেও নর ও নারী সুখ অনুভব করে না। তার কারণে আবারও চলে আসে প্রবৃত্তির তাড়না দ্বারা সৃষ্ট চাহিদা পূরণের আকাঙ্ক্ষা। মানুষ প্রকৃতিজাতভাবে সৃজনশীল। অথচ সভ্যতা জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, জন্ম ও পরিবারভেদে নারী ও পুরুষের জন্য কাজের তালিকা তৈরি করে দেয়। মানুষের তৃপ্তি হয় না তার প্রবৃত্তির তাড়নার বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করতে। মানুষ মেনে নিতে পারে না তার প্রবৃত্তির ওপর শক্ত নিয়ন্ত্রণ। ফ্রয়েডের মতে, সভ্যতার সাংস্কৃতিক চলনের সঙ্গে সবার আগে বিরোধ বাধে মেয়েদের। মেয়েরা পারিবারিক ও সাংসারিক গণ্ডিতে নিজেদের আবদ্ধ করার কারণে পুরুষেরা পরিবারের বাইরে নিজেদের মধ্যে

একধরনের পুরুষ জাতি 'নরগোষ্ঠী' তৈরি করে, আর মেয়েদের ওপর বাকি সব কাজের চাপ দেওয়া হয়। যেহেতু মানুষের অসীম শারীরিক শক্তি নেই, সময়ের সঙ্গে তার শক্তি ক্ষয় হতে থাকে, তাই পুরুষ তার সীমিত সময়ের মধ্যে তার গোষ্ঠীর বাকি পুরুষদের নিয়ে কাজ সম্পন্ন করতে অনেক সময় দিয়ে দেয়। তাতে অনেক সময় পুরুষ পিতা বা স্বামী হিসেবে তার কাজে গাফিলতি করে। ফলে মেয়েরা বাধ্য থাকে পরিবারের কাজের দায়িত্ব নিজের ওপর নিতে, আর সেখান থেকে শুরু হয় সভ্যতার প্রতি মেয়েদের বিরূপ মনোভাব। প্রবৃত্তির ওপর সভ্যতার শক্ত নিয়ন্ত্রণ নারী ও পুরুষকে একে অপরের বিপক্ষে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। যেহেতু সভ্যতা ব্যক্তির কষ্ট প্রশমনে কাজ করে না, নিজের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে কাজ করে, সে এই ধরনের অতৃপ্ত পুরুষ মননগুলোকে নিজের বলয়ে জায়গা দেয়। তাদেরকে বলা হয় তারা শক্তিশালী ও সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাদের অবস্থান পরিবারে সবার ওপরে এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের, বিশেষ করে নারীর কাজ তাদেরকে সেবা দেওয়া। তারা সেবামূলক কাজের জন্য পরিবারে নারীর শরণাপন্ন হয় সভ্যতার বিধান দিয়ে। আর সভ্যতা এই নারীদের রাখে বলয়ের বাইরে। যাতে পুরুষ তাদের নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করার একটা জায়গা পায়। সভ্যতার বিভক্তি নীতি। এই বিভক্তি বজায় রাখতে রাষ্ট্র ব্যবহার করে ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও তার প্রতিষ্ঠানগুলোকে। এই কারণে রাষ্ট্র প্রতিনিধিরা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক কথা বলে পুরুষদের জানায়, সভ্যতা এখনো তাদের পক্ষে। পুলিশ মামলা না নিয়ে বার্তা পৌঁছায় নারীর প্রতি সহিংসতা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়, এটি একটি পারিবারিক ব্যাপার। আর এসব সুযোগে নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে পুরুষ নিজেদের হিংস্রতা প্রশমন করার জন্য নারী ও শিশুকে বেছে নেয়। নিজের অপরাধবোধের দায়ভার নারীর ওপর চাপিয়ে দেয়। পুরুষের যৌন তাড়নার উদ্রেক হলে সে মনে করে, তার তৃপ্ত হওয়ার যৌক্তিক অধিকার আছে এবং তার জোগান দেওয়া নারীর কর্তব্য। ফ্রয়েড নারীর ওপর পুরুষের এমন প্রচণ্ড নির্ভরশীলতাকে এই জন্যই বিপজ্জনক বলেছেন। কারণ, পুরুষ তার জীবনের এই মুখ্য সাহায্যকারীকে সব সময় নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে। আর এই নিয়ন্ত্রণের প্রচণ্ড প্রয়োজনীয়তা থেকে সমাজে বেড়ে চলবে নারীর প্রতি অবিচার।

৩

করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে একদিকে কর্মসংস্থান কমছে, মানুষ কাজ হারাচ্ছে, দারিদ্র্য বাড়ছে, শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ছাত্রী ঝরে পড়ছে, অপর দিকে দেশে আগে থেকেই বাল্যবিবাহের হার বেশি, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় অনেক কম এবং নারীর ওপর নির্যাতনের হার বেশি। এই ধরনের

সংকটময় পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশের মতো সমাজ যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্মীয় ও প্রচলিত ধ্যানধারণার ব্যাপারে সংবেদনশীল, সেখানে পুরুষেরা সামনে এগিয়ে আসে, সমাজের সংকট মোকাবিলায় প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে কাজ করে। আর নারীরা ঘর, পরিবার, সন্তান ও বয়োজ্যেষ্ঠদের দায়িত্ব নেয়। অর্থাৎ এই মহামারি পরিস্থিতিতে বাড়ির বাইরের সব কাজের দায়িত্ব ছেলেরা নেবে আর মেয়েরা ঘরসংসারের কাজে মনোনিবেশ করবে।

যেহেতু কাজের সুযোগ কমে যাচ্ছে, পরিবারের আয়ের গুরুদায়িত্ব ছেলেদের, তাই যেটুকু কাজের সুযোগ আছে, তা আগে ছেলেদের দ্বারা পূরণ হবে। কারণ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ শিখিয়েছে পরিবারের ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার সব দায়িত্ব পুরুষের। সভ্যতা পুরুষতান্ত্রিক; তার চিন্তা, অনুশীলন ও ধারাবাহিকতা পুরুষকেন্দ্রিক। সভ্যতা তার বিধান রচনা করে রাখে। সেখানে নারী-পুরুষের কাজের তালিকা বা অবদান রাখার ক্ষেত্র—সবই নিয়ন্ত্রিত। নারী-পুরুষের সম্পর্কে ভালোবাসা, সম্মান বা উদারতা অনুশীলনের দায়িত্ব সভ্যতা নেয় না। সভ্যতা কেবল ওপর দিয়ে কিছু মানদণ্ড ধার্য করে দেয়, তার সমাজে কে কী দায়িত্ব পালন করবে আর করবে না। সেখানে মানুষের ব্যক্তিগত সুখের জায়গা কম। মানুষকে শেখানো হয় সমষ্টির স্বার্থেই সুখ; প্রতিবেশীকে ভালোবাসো, শত্রুকে ক্ষমা করো। কিন্তু ব্যক্তিপর্যায়ের কষ্ট, যা অতৃপ্তি থেকে তৈরি হয়, তা প্রশমনের জন্য মানুষ সভ্যতার দিকে তাকিয়ে থাকে। কারণ, সভ্যতা মানুষকে আশ্বাস দেয় সে সবার মধ্যে বন্ধন অটুট রাখবে। কিন্তু বাস্তবে মানুষ তা পায় না সভ্যতা থেকে।

ফ্রয়েড নিজের মধ্যে oceanic feeling বা 'মহাসামুদ্রিক অনুভূতির' যে কথা উল্লেখ করেছেন, যা তার পরিপার্শ্বের সঙ্গে তার সংযোগের এক অনুভূতি, মানুষ দিন দিন সেই প্রবাহ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ফ্রয়েড বলেন, তিনি এখন আর নিজেকে তার পরিপার্শ্বের সঙ্গে যুক্ত মনে করেন না। আমাদের সমাজেও মানুষের মধ্যে যেন তার পরিপার্শ্বের সঙ্গে সংযোগ ছিন্নের প্রদাহ চলছে। মানুষ এখন আর অপরকে বিশ্বাস করতে পারে না। অতৃপ্তি আর অপ্রাপ্তির বেদনায় সে দিন দিন হিংস্র হয়ে উঠছে। হিংস্রতা প্রকাশকে পুরুষত্বের বাহাদুরি বলে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। তাকে দিয়ে রাখা হয়েছে তার পরিবারের পরিসর। যারা পরিবারের বাইরে নিজেকে যত দূর ছড়িয়ে দিতে পারছে, তার হিংস্রতা প্রকাশের পরিসর ততই বিস্তৃত হচ্ছে। ফলে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। পরিবার, পাড়া, স্কুল, মাদ্রাসা, রাস্তা, বাড়ি—কোথাও নারী ও শিশুরা নিরাপদ নয়। পুরুষেরা যেহেতু সমাজে গর্বের সঙ্গে সব স্থান দখল করে আছে, তাতে নারীরা প্রান্তিকে পরিণত হচ্ছে। পরিবার, সমাজ, শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, সংস্কৃতি, সভ্যতা—সব পেরিয়ে এই প্রতিষ্ঠিত, সুগঠিত ও সুবিশাল পুরুষ দলকে সে মোকাবিলা করছে তার প্রতিটি পদক্ষেপে। পুরুষ, সমাজে তার

দখল করা জায়গা নারীর সঙ্গে ভাগ করতে নারাজ। কারণ এক. সে নিজের অপ্রাপ্তিতে অসুখী এবং দুই. তার প্রতিযোগিতা বেড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থানের লড়াইয়ে পুরুষ যত না তার কর্মদক্ষতা ব্যবহার করছে, তার থেকে বেশি ব্যবহার করছে সভ্যতার শিক্ষা, লিঙ্গভেদের সুবিধা। পুরুষের সেই প্রবৃত্তির সুখ লাভের স্পৃহা, যা তার যৌন সঙ্গীকে সঙ্গে রেখে তাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়, সেই সুখকে সে অনিশ্চিত মনে করছে। কারণ, সভ্যতা তাকে নিয়ম শিখিয়েছে কীভাবে তার সেই অবিচল সুখ লাভের উৎসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। নারীর ওপর পুরুষের প্রচণ্ড নির্ভরশীলতা তাকে নারীর ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে বাধ্য করছে তার অন্তরের অনিরাপত্তাহীনতা দূর করার জন্য। সমাজে নারীর ওপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতন সমাজের বিভাজনের ফল। এই নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় আমরা নির্যাতন বন্ধ করার কৌশল নিয়ে বেশি কাজ করি, সমস্যার গোড়াটা অস্পষ্ট রেখে দিই।

অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বর্তমান সময়ের পরিবর্তনের গতি অসম্ভব দ্রুত। মানুষ এই পরিবর্তন বোঝার আগেই বাজার এসে জেঁকে বসেছে চিন্তাচেতনা, জীবিকা ও চাহিদার ওপর। বাজারের ভোক্তা ও সেবক—দুই-ই জনগণ, আর পরিচালক হলো ব্যবসায়ীরা। ক্ষমতালোভীদের দ্বন্দ্বে পুঁজিবাদী বাজার রাজনীতির হাল ধরেছে; রাজনীতি এখন আর মানুষকে নয়, বাজারকে সেবা দেয়। আর তাতে এই আধুনিক যুগে মানুষের ওপর শোষণের বৈধতা নিয়ে গড়ে উঠেছে এক 'নব্য-দাস' প্রথা। ফ্রয়েডের মতে, সভ্যতা হলো প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ও মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা। পুরো বিশ্বের জনগণ কেবল পৃথিবীজুড়ে কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিবার বা তাদের কোম্পানিগুলোকে সেবা ও শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। আর সেই চক্রে চলছে পুরো পৃথিবীর জনশক্তি, তাদের কর্মসংস্থান ও জীবন। এই চক্র থেকে মানুষ যেন বের হতে না পারে, তাকে পরিকল্পিতভাবে অজ্ঞ বা অচেতন বানিয়ে রাখতে সাহায্য করছে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা। এ যেন একধরনের indoctrination বা মতদীক্ষাদান। এই মতদীক্ষাদানের কাজ চলে শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চর্চা এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে।

আপাতদৃষ্টিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পুঁজিবাদনির্ভর এক পৃথিবী তৈরির প্রক্রিয়ায় মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের ধারা একবিংশ শতাব্দীতে এসে নতুন গতি পেয়েছে। মহামারির কবলে পড়ে পুরো বিশ্বের জনগণ যখন ঘরে বন্দী, নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছে, তখন মানুষ সুখ অনুভব করছে না। মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদাগুলো পূরণ হচ্ছে না বলে সে কষ্ট পাচ্ছে। মানুষ সময় উপযোগী শিক্ষা পাচ্ছে না বলে সে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। তাতে তার কষ্টের উদ্রেক হচ্ছে নিজের তুলনামূলক অক্ষমতার সামনে পড়ে। সমাজে বেড়ে ওঠা শ্রেণি, লিঙ্গ, শিক্ষা,

ধর্মবৈষম্যের কারণে সে নিজেকে সুবিধাবঞ্চিত মনে করছে। বাজার মানুষকে যে চাকচিক্যময় জীবনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, তা পেতে হলে তাকে যে কষ্ট করতে হয়, তাতে তার আত্মতুষ্টি হচ্ছে না। আবার সেই বাজার-দর্শন ধারণ করতে না পারলে সে নিজেকে সমাজের বাইরে প্রান্তিক বলে মনে করছে। এমন অবস্থায় তার মধ্যে যে কষ্টের সৃষ্টি হচ্ছে, তা সে কীভাবে মোকাবিলা করছে?

করোনাকালে যখন মানুষ তার বাইরের সব কাজ বন্ধ করতে শুরু করল, মানুষের অপ্রাপ্তিগুলো তার পরিবার-পরিজনের সামনে আসতে শুরু করল। সভ্যতা পুরুষ ও নারীভেদে সমাজে কিছু কর্মবিধান তৈরি করেছে, যা সে পালন করতে না পারলে অপরাধবোধে ভোগে। যেমন ফ্রয়েড বলেছেন, মানুষ সময়ের সঙ্গে বুঝতে পারে যে সভ্যতার শিক্ষায় জীবন চালানো খুব কঠিন। মানুষ তখন কিছু অপরাধবোধের সঙ্গে আপস করে ফেলে। কিন্তু সে চায় না যে তার অপরাধবোধ ও আপসগুলো জনসমক্ষে আসুক। করোনার মধ্যে বাড়িতে বন্দী মানুষ এখন আর তাদের জীবনের অসফলতাগুলোকে পরিবার থেকে আড়াল করতে পারছে না। ফলে তাদের অপরাধবোধ তাদেরকে হিংস্র করে তুলছে। এই হিংস্রতার ফলে মানুষ লিপ্ত হয়ে পড়ছে নানান অপরাধমূলক কাজে। এর মধ্যে অন্যতম হলো পারিবারিক সহিংসতা।

সময়ের সঙ্গে পরিবেশ, পরিস্থিতি, সমাজ, শিক্ষা, দক্ষতা, রাজনীতি, অর্থনীতি—সব বদলেছে। বদলেছে সমাজের চাহিদা, অনুশীলন এবং নারী-পুরুষের ভূমিকা। কিন্তু সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলায়নি সমাজের মানসিকতা। সমাজের মানসিকতা এমন পশ্চাৎ-মুখী হওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হলো সভ্যতা। সভ্যতা যেহেতু মানুষের ব্যক্তিগত সুখের দায়িত্ব নেয় না, তাই ক্ষতিপূরণস্বরূপ তার অন্যান্য কিছু সুখ লাভের ব্যবস্থায় বাধা দেয় না। সেই কারণে যখন নারীর ওপর অবিচার হয়, সভ্যতা তাকে জায়েজ করার উপায় বাতলে দেয়। আর এভাবেই চলতে থাকে নারীকে দুর্বল বানিয়ে তার ওপর নির্যাতন। নারীকে সব রকমের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখে তার ক্ষুদ্র পৃথিবীকে কবজা করার মধ্যে পুরুষত্ব নেই। বরং নারীর সমতায়নের মাধ্যমে জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে নিজেদের উদ্ভাবনী দক্ষতা প্রমাণ করেই নিজেদের উন্নত ভাবমূর্তি রক্ষা করা প্রয়োজন। নারী ও পুরুষের অবস্থান ও কর্মসমতা, ন্যায়বিচার ও সম্মানের ওপর ভিত্তি করে সমাজ গড়ে তোলাই বর্তমান সময়ের দাবি।

তথ্যসূত্র

১. Statistics on Human Rights Violations. *Ain O Shalish Kendra* Retrieved on 25 November 2020 from : http ://www.askbd.org/ask/statistics-on-human-rights-violations/?_page=48

২. Rahman, M. 'Writ filed against police for not accepting attempted rape case'. 12 October 2020. *Dhaka Tribune.* Retrieved from : https ://www.dhakatribune.com/ bangladesh/court/2020/10/12/writ-filed-against-police-for-not-accepting-attempted-rape-case

যেসব বইয়ের তথ্য-উপাত্ত এই লেখায় ব্যবহার করা হয়েছে এবং বিষয়বস্তু বুঝতে সাহায্য করেছে—

১. Freud, S. (1930). *Civilization and its discontents.* Penguin Books.

২. Sapolsky, R. (1996). *Biology and Human Behavior : The Neurological Origins of Individuality.*

৩. Harari, Y. (2015). *Sapiens : A Brief History of Humankind.*

লে খ ক প রি চি তি

তারিক ওমর আলি

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশীয় ইতিহাসের সহযোগী অধ্যাপক। পিএইচডি করেছেন ইতিহাসের ওপর, যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত বই *আ লোকাল হিস্ট্রি অব গ্লোবাল ক্যাপিটাল : জুট অ্যান্ড পিজ্যান্ট লাইফ ইন বেঙ্গল ডেল্টা*, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস (২০১৮)।

মির্জা হাসান

সামাজিক বিজ্ঞানী হিসেবে বর্তমানে কর্মরত আছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে (বিআইজিডি)। পড়াশোনা করেছেন ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ হলো 'পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশন ইন বাংলাদেশ,' *কনফ্লিক্ট, সিকিউরিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট*, ইউকে। প্রকাশিত বইয়ের অধ্যায়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত *ডিলস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট* বইয়ের 'পলিটিক্যাল ইকোনমি অব স্টেট-বিজনেস রিলেশনস ইন বাংলাদেশ' নামক অধ্যায় এবং একই প্রেস থেকে প্রকাশিত *পলিটিক্যাল ইকোনমি অব এডুকেশন ইন বাংলাদেশ* বইয়ের 'পলিটিক্যাল ইকোনমি অব প্রাইমারি এডুকেশন ইন বাংলাদেশ' নামক আরও একটি বইয়ের অধ্যায়।

নাওমি হোসেন

রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক। যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টেবিলিটি রিসার্চ সেন্টারে কর্মরত রয়েছেন। যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ থেকে ডিফিল ডিগ্রি নিয়েছেন। লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে এমএসসি ডিগ্রি নিয়েছেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলোসফি, পলিটিকস অ্যান্ড ইকোনমিকস বিভাগ থেকে বিএ অনার্স সম্পন্ন করেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ : *দ্য পলিটিকস অব এডুকেশন ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ : ফ্রম স্কুলিং টু লার্নিং*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস (২০১৯)।

বদরুল আলম খান

বদরুল আলম খান দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষকতার পর বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনিতে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা *পুঁজিবাদের সমাজতত্ত্ব* (সম্পাদনা), *সংঘাতময় বাংলাদেশ: অতীত থেকে বর্তমান* (২০১৫), *গণতন্ত্রের বিশ্বরূপ ও বাংলাদেশ* (২০১৭) এবং *বিশ্বায়ন: ইতিহাস ও গতিধারা* (২০১৮) প্রথমা প্রকাশন থেকে বের হয়েছে। একই প্রকাশনী থেকে *সোভিয়েত রাশিয়া: ভাঙনের ইতিবৃত্ত* (২০২১) নামক আত্মজীবনীমূলক আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশিতব্য।

হাফিজা বেগম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক শিক্ষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ইউনিভার্সিটি অব মালায়া, কুয়ালালামপুর থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পিএইচডি করেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী। রাজনীতি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং অন্যান্য জেন্ডার ইস্যু নিয়ে তিনি লেখালেখি ও বিশ্লেষণ করেন।

গ্লোবাল ডায়নামিক ইন্টারভেনশন স্ট্র্যাটেজিস ফর কোভিড-১৯ কোলাবরেটিভ গ্রুপের লেখকদের পরিচিতি

রাজীব চৌধুরী, ডেইজি ওকোনোফুয়া এবং সারা শাহজেদ যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেলথ অ্যান্ড প্রাইমারি কেয়ারে কর্মরত। **কেভিন হেং** কর্মস্থল সুইজারল্যান্ডের বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর স্পেস অ্যান্ড হ্যাবিট্যাবিলিটি। **মো. সাজেদুর রহমান শাওন** অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর বিগ ডেটা রিসার্চ ইন হেলথ-এ কর্মরত। **গ্যাব্রিয়েল গো** যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোতে অবস্থিত ওপেন এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে কর্মরত। **ক্যারোলিনা ওচোয়া-রোসালেস** নেদারল্যান্ডসের ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টার রটারড্যামে এপিডেমিওলজি বিভাগে কর্মরত। **ভ্যালেন্টিনা গঞ্জালেস-জারামিল্লো, ক্রিশ্চিয়ান এল আলথুস, নাথালিয়া গঞ্জালেস-জারামিল্লো এবং ওসকার এইচ ফ্রাঙ্কো** সুইজারল্যান্ডের বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল অ্যান্ড প্রিভেনটিভ মেডিসিনে কর্মরত। **আব্বাস ভূঁইয়া** স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যাবিষয়ক স্বাধীন গবেষক, ঢাকা,

বাংলাদেশ। **ড্যানিয়েল রিডপাথ** আইসিডিডিআরবি, ঢাকা বাংলাদেশে কর্মরত। **শামিনি প্রথাপন** শ্রীলঙ্কার শ্রী জয়াবর্ধনেপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগে কর্মরত।

আইরিন খান

লেখক, গবেষক ও চিত্রশিল্পী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য জার্মান সরকার প্রদত্ত DAAD Scholarship লাভ করেন। তাঁর সামাজিক কাজের জন্য তিনি আমেরিকা সরকার কর্তৃক International Visitor Leadership Program-এ অংশগ্রহণ করেন। তিনি আইক্যান ফাউন্ডেশন নামে এক দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, যা নারী ও শিশুর ওপর অত্যাচার ও বৈষম্য নিরসনে কাজ করে। এই লেখার বিষয়ে আপনার মতামত বা কোনো প্রশ্ন থাকলে ই-মেইল করুন writeto@ayreenkhan.com-এ।

সারা বছর সেরা বই

প্রবন্ধ, গবেষণা ও অন্যান্য

- **রুশ বিপ্লব, স্তালিন-বিতর্ক ও রবীন্দ্রনাথ** ৳ ৩৮০
  আহমদ রফিক
- **কেমন আছে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান** ৳ ২৫০
  মিলন দত্ত
- **অতীশ দীপঙ্কর রচনাবলি** ৳ ৫০০
  অনুবাদ ও সম্পাদনা : রায়হান রাইন
- **অফিস পলিটিকস** ৳ ৩২০
  আবীর শওকত হায়াত
- **স্মৃতিতে অনুভবে আবুল হাসনাত** ৳ ২৫০
  সম্পাদনা : মতিউর রহমান
- **জাদুশিল্পী হুমায়ুন আহমেদ** ৳ ২৫০
  এম এ জলিল
- **An Inclusive Democracy for a Just Society : Reigniting the Spirit of the Liberation Struggle** ৳ ২৮০
  Rehman Sobhan
- **Civil Society, State & Democratic Futures in Bangladesh** ৳ ৩৫০
  Imtiaz Ahmed

সমাজ-ইতিহাস গ্রন্থমালা

- **স্বৈরাচারের দশ বছর** ৳ ৫৫০
  আতাউর রহমান খান
- **বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)** ৳ ৬০০
  কামরুদ্দীন আহমদ

দিনলিপি

- **তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি ১৯৪৭-৪৮** ৳ ৪০০
  তাজউদ্দীন আহমদ
- **বাসিত জীবন : সৈয়দ হকের সঙ্গে শেষ দিনগুলো** ৳ ৫০০
  আনোয়ারা সৈয়দ হক

অনলাইনে বই কিনুন
www.prothoma.com
ProthomaProkashon

প্রথমা প্রকাশন

- ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা। ০১৯৫৫৫৫২১৭৭
- ৪৩-৪৪ আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। ০১৯৫৫৫৫২১৭৬

রূপালী ব্যাংকের মাধ্যমে ফরেন রেমিট্যান্স আনুন
এবং
সরকার প্রদত্ত প্রণোদনা গ্রহণ করুন

২%

রেমিটেন্স প্রণোদনা
নগদ অর্থ প্রদান

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে প্রতিচিন্তার গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। এ ছাড়া বিকাশের মাধ্যমেও গ্রাহক হওয়া যাবে (বিকাশ নম্বর : ০১৯৫৫৫৫২০৬৯)। ডাকযোগে নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ টাকাও পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যাবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ৪০০ (চার শ) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৮০০ (আট শ) টাকা ও ৬৫ (পঁয়ষট্টি) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে),
গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬